উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসলের
চাষাবাদ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল

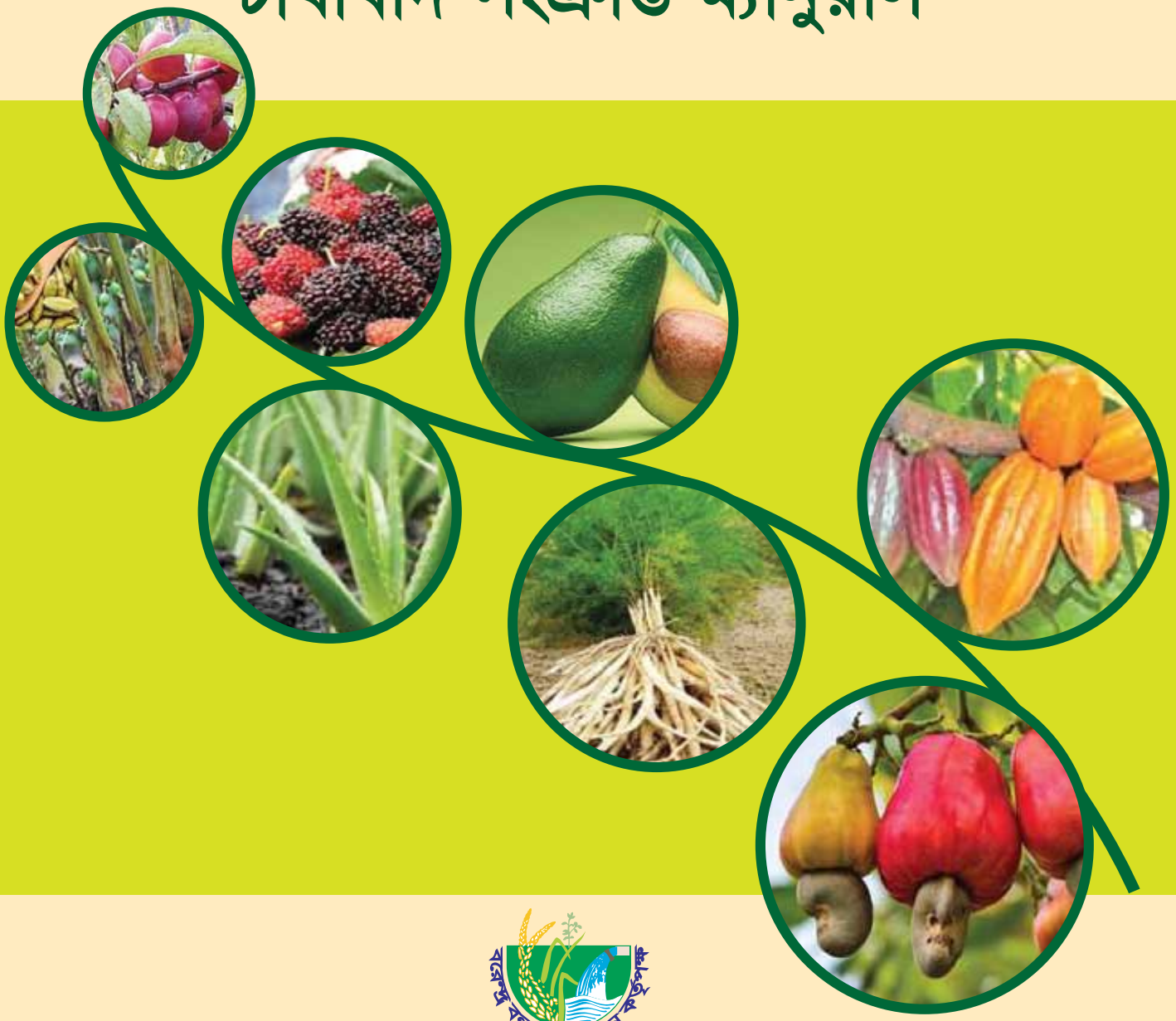

বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী

স্বয়ম্ভরতাই আমাদের অঙ্গীকার

প্রকাশনায় :
জনাব এ.টি.এম রফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও
ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

সহযোগিতায় :
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম
সহকারী ব্যবস্থাপক (কৃষি)
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

জনাব মোঃ হাফিজুল কবীর
সহকারী ব্যবস্থাপক (কৃষি)
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

জনাব ওবাইদুর রহমান
পরিদর্শক
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

উৎস : অত্র ম্যানুয়ালের তথ্য, উপাত্ত ও ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত

মুদ্রণে : সরকার প্রিন্টিং, রাণীবাজার, রাজশাহী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
চেয়ারম্যান
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজশাহী

বাণী

"বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প" এর আওতায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসলের চাষাবাদ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদন হওয়ায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসলের চাষাবাদ জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে চারা ও বীজ বিতরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী বাগান সৃজনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত সময়োপযোগী পরিকল্পনাসমূহ যেমন-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ এর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ ইতোমধ্যে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সরকারের বর্তমান অভিপ্রায় সবার জন্য পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা, কেননা স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহন অপরিহার্য। পুষ্টি উপাদানের জন্য শাক-সবজির পাশাপাশি ফলমুলের গুরুত্ব অপরিসীম। ফল ও সবজি শুধুমাত্র আমাদের রসনার তৃপ্তি দেয় না, আমাদের দেহে পুষ্টি উপাদান সরবরাহেও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। শরীর ভাল রাখার জন্য একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রতিদিন ফল খাওয়া উচিত। সুস্থ ও সবল থাকার জন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি পুষ্টিকর স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস তৈরি করা বর্তমান সময়ের দাবী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে যে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন তা কেবল পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসকে সম্পৃক্ত করে একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনের মাধ্যমেই সম্ভব। বিষয়টির উপর সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং বিভিন্ন জোন ও রিজিয়নের সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত জরুরী যা এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণে ব্যবহারের লক্ষ্যে উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসলের চাষাবাদ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল প্রস্তুত করার গৃহীত উদ্যোগ প্রশংসনীয়। প্রশিক্ষণের উদ্যোক্তাগণকে এবং ম্যানুয়াল প্রকাশের উদ্যোগকেও আমি স্বাগত জানাই। আমি প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য সকল কাজের সার্বিক সাফল্য এবং সংশ্লিষ্ট সবার সুস্থ্যতা কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

বেগম আখতার জাহান (সাবেক সংসদ সদস্য)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
নির্বাহী পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজশাহী

মুখবন্ধ

উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশই দানা জাতীয় ফসল। আমরা প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিভিন্ন ধরনের ফল বিদেশ থেকে আমদানি করে আমরা কনজিউম (Consume) করছি। আমাদের দেশে আমরা এই সমস্ত ফল ও ফসল চাষাবাদ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করতে পারি। বরেন্দ্র অঞ্চলে আমরা এই সমস্ত উচ্চমূল্য ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে আমরা এই প্রকল্পটি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি স্যার এর নির্দেশনায় গ্রহণ করেছি।

অল্প সময়ে ম্যানুয়ালটি প্রকাশ করায় আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। ম্যানুয়ালটির উৎকর্ষতা, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য যেকোন পরামর্শ ও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। আমি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ প্রকল্পের সার্বিক কাজের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আব্দুর রশীদ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রকল্প পরিচালক
বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও
ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

ভূমিকা

দানাজাতীয় খাদ্যশস্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ন। কিন্তু উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল, ঔষধি ফসল, মসলা জাতীয় ফসল, বেভারেজ জাতীয় ফসল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এতে করে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। অথচ আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সমস্ত ফল ও ফসল চাষ করা সম্ভব; শুধুমাত্র উদ্যোগের অভাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে এ সমস্ত ফল ও ফসলের চাষাবাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য বর্তমান মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় ''বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প'' বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বিভিন্ন উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল যেমন- কাজুবাদাম, ড্রাগন, এভোকাডো, লংগান, পার্সিমন, পিচ, কমলা, পোমেলো, মালবেরী, কাষ্টার্ড আপেল, হলুদ বারহী খেজুর, অপ্রচলিত আম, কাঁঠাল ইত্যাদি; ঔষধি ফসল যেমন-এ্যালোভেরা, শতমূলী, মিছরি দানা, ডেওয়া ইত্যাদি; মসলা জাতীয় ফসল যেমন- আলুবোখরা, দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা; বেভারেজ জাতীয় ফসল যেমন- কফি, কোকোয়া; উচ্চমূল্য মাঠ ফসল যেমন- চিয়াসীড, মিষ্টি ভূট্টা, যব, কাউন, বাদাম, এ্যাসপারাগাস, বীনস ইত্যাদির চারা/বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণের সুযোগ রয়েছে যাতে করে বরেন্দ্র অঞ্চলে এ সমস্ত ফল ও ফসলের চাষাবাদ জনপ্রিয় হয় এবং এ সমস্ত অপ্রচলিত ফল ও ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কে অবহিত করণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। তদুপরি উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসলের উপর একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীগণ অপ্রচলিত ফল ও ফসলের উপর সম্মক ধারনা পান। ম্যানুয়ালটি প্রস্তুতে প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক কমিটি যথেষ্ট পরামর্শ দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সর্বোপরি বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সার্বিক নির্দেশনা পেয়েছি তা শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করছি। ম্যানুয়ালটি নির্ভুল রাখার চেষ্টা সত্বেও ভুল থেকে যেতে পারে, পরবর্তী সংস্করণে যাতে এটি আরো তথ্যবহুল, নির্ভুল করা যায় সেজন্য যে কোন সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

(এ.টি.এম রফিকুল ইসলাম)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	ফল ও ফসলের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	কাজু বাদাম	১
০২	ড্রাগন ফল	৩
০৩	এভোগাডো	৬
০৪	পার্সিমন	৯
০৫	কমলা	১১
০৬	কফি	১৪
০৭	ইজিপশিয়ান ডুমুর	১৭
০৮	আলুবোখরা	১৯
০৯	কোকোয়া	২১
১০	লংগান	২২
১১	পিচ ফল	২৫
১২	পোমেলো (জাম্বুরা)	২৬
১৩	মালবেরি বা তুঁত	২৬
১৪	কাষ্টার্ড আপেল	২৭
১৫	হলুদ বারহী খেজুর	২৭
১৬	আম	২৭
১৭	থাই সুপার ফাষ্ট কাঁঠাল	২৮
১৮	বল সুন্দরী বরই	২৮
১৯	সফেদা	২৮
২০	জাবাটিকাবা	২৯
২১	গোলাপজাম	২৯
২২	কালোজাম	২৯
২৩	অ্যালোভেরা	৩০
২৪	শতমূলী	৩০
২৫	মিসরি দানা	৩০
২৬	ডেউয়া	৩০
২৭	এলাচ	৩১
২৮	তেজপাতা	৩১
২৯	কাউন	৩১
৩০	চিয়া সীড	৩২
৩১	চীনাবাদাম	৩৩
৩২	বীনস	৩৪
৩৩	যব	৩৪
৩৪	মিষ্টি ভুট্টা	৩৫

উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসলের চাষাবাদ কলাকৌশল

কাজু বাদাম

পরিচিতি

কাজু বাদাম সুস্বাদু একটি বাদাম। ফলের বীজ বাদামের ন্যায় খাওয়া হয় বলে এর নাম হয়েছে কাজুবাদাম (Cashewnut) এবং ফলকে বলা হয় কাজু আপেল (Cashew Apple). কাজুবাদাম এমন একটা ফল যার বাণিজ্যিক গুরত্ব অপরিসীম। গাছের শিকড় গভীরে পৌছায়, মাটির উপরি ভাগে তা বেশি বিস্তার লাভ করে। পাহাড়ের ঢালে, উপকূলীয় বেলে অনুর্বর মাটি এবং বরেন্দ্র এলাকার মাটিতেও এ ফল আবাদ করার ভালো সম্ভাবনা রয়েছ। এ ফল চাষের জন্য তেমন উর্বর জমির প্রয়োজন হয় না। কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

পুষ্টিমান

কাজু আপেল (বীজ যে অংশে লেগে থাকে) এবং কাজু বাদাম উভয়েই পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। একটা কমলা লেবুতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় কাজু বাদামে তার চেয়ে ৫ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' থাকে। এ ছাড়া ভিটামিন এ, বি১, বি২, বি৩, বি৫, বি৬, বি৯, বি১২ প্রভৃতি ভিটামিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, জিঙ্ক প্রভৃতি খনিজ উপাদান থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম কাজুবাদামে ৩০.১৯ গ্রাম শর্করা, ১৮.২২ গ্রাম আমিষ, ৪৩.৮৫ গ্রাম চর্বি বিদ্যমান থাকে।

জাত

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে যে সব জাত আছে সেগুলো কয়েক দশকের পুরানো। বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাত গুলো নিম্নরূপ:

ক্র. নং	দেশের নাম	হাইব্রিড জাতের নাম	মন্তব্য
১.	ভারত	এইচ-১৩০, ভাস্কারা, ভেঙ্গুরলা-৬, ভেঙ্গুরলা-৭, ভিএলএ-৪, উলাল-৪, উলাল-৩	বাংলাদেশে বর্তমানে ভিএলএ-৪ ও ভাস্কারা জাতের চাষ হচ্ছে।
২.	ভিয়েতনাম	ভিএন-০৯	-
৩.	আইভরিকোষ্ট, আফ্রিকা	আইভিসি-১৯	-

গর্ত তৈরী ও চারা রোপন

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোটো করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোড়ায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। কাজুবাদাম সাধারণত ১৩-১৫ ফিট দূরত্বে চারা/কলম রোপন করা হয়। তবে বরেন্দ্র এলাকার জন্য ঘন করে গাছ লাগানো যেতে পারে। বাগানের লে-আউট তৈরী করে নির্দিষ্ট স্থানে অন্তত ১.৫ ফিট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ১ ফিট গভীর বৃত্তাকার গর্ত করতে হবে। গর্তে পঁচা গোবর বা পঁচা আর্বজনা সার ১৫ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম, জিপসাম ২০০ গ্রাম এবং মাটির পোকা দমনে ৫০ গ্রাম 'কার্বোফুরান' দিতে হবে। মাদা তৈরী শেষে তাতে ২ সপ্তাহ পর কাজু বাদামের চারা রোপন করা যেতে পারে। চারা রোপনের সময় শিকড় বল যাতে না ভাঙ্গে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সতর্কতার সাথে শিকড় বল জমির সমতলে স্থাপন করে রোপন করতে হবে এবং শক্ত ঠেসকাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

ফলন্ত গাছে প্রতি বছর যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত ছকে দেয়া হলো ঃ

সারের নাম	কাজুবাদাম গাছে বয়স ভিত্তিক সার প্রয়োগ (বছর)			
	১-২	৩-৫	৬-১০	১০ এর উর্দ্ধে
গোবর/আর্বজনা পঁচা (কেজি)	১০	১৫	২৫	৩৫
ইউরিয়া (গ্রাম)	৫০০	১০০০	১৭০০	২০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	৪৫০	৬৫০	৮০০
এমওপি (গ্রাম)	২৫০	৪৫০	৬৫০	৮০০
জিপসাম (গ্রাম)	২০০	৩০০	৩৫০	৩৫০

এ সারগুলো দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে বছরে দু'বার প্রয়োগ করা প্রয়োজন হবে। কেবল জিপসাম পুরোটাই বছরে একবার মে-জুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট সারগুলো প্রথম বার অর্ধেক পরিমান মে-জুন মাসে এবং দ্বিতীয় বার বাকী অর্ধেক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি বার সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিয়ে গাছের গোড়া ভালোভাবে ভেজাতে হবে।

ট্রেনিং প্রুনিং

প্রথম ৩-৪ বছর গাছের কান্ড ও গাছের আকার গঠনের জন্য ট্রেনিং প্রুনিং করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এ সময় গাছের কান্ড ৩-৪ ফিট পর্যন্ত বাড়তে দিতে হবে। বেশি বাড়ন্ত কচি ডাল গজালে যা 'ওয়াটার শাখা' নামে পরিচিত তা অপসারণ করতে হবে। লাগানো গাছ উচ্চচতায় ১২-১৫ ফিট পর্যন্ত হলে আগা ছাঁটাই করে দিয়ে গাছকে পাশে বেশি ডাল ছড়াতে/ বাড়তে দেয়া প্রয়োজন।

মালচিং

প্রতিটা রোপিত গাছের গোড়া থেকে ৮-১০ সে.মি. দূরে শুকনা কচুরী পানা, খড়কুটা, গাছের লতা-পাতা দিয়ে ১২-১৫ সে.মি. পুরু মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যবস্থায় গাছের গোড়া ঠান্ডা থাকবে, আগাছা গজাবে না, মাটিতে রস সংরক্ষিত থাকবে, মাটির ক্ষয়রোধ হবে এবং পরবর্তীতে এগুলো পঁচে জৈব সার হিসাবে কাজ করবে।

পরিচর্যা

কাজুবাদাম গাছের গোড়ার চারদিক সব সময় আগাছামুক্ত রাখা দরকার। রোপনের পর থেকেই গাছকে কাঁঠি দিয়ে সোজাভাবে বাড়তে সুবিধা দেয়া ও হেলে পড়া রোধ করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড়

রোগের মধ্যে চারা মরা, ডাল শুকানো, অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ অন্যতম। রোগ দমনে আক্রান্ত অংশ ছাটাই ও পরিষ্কার করে ধ্বংস করতে হবে এবং অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন : ব্যাভিস্টিন, ব্লাইট অথবা ডায়থেন স্প্রে করতে হবে। পোকার মধ্যে কান্ড ও শিকড় ছিদ্রকারী পোকা, পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা ও থ্রিপসের আক্রমন দেখা যায়। পোকা দমনে গাছের গোড়ায় দানাদার কীটনাশক যেমন: ফুরাডান এবং গাছে তরল কীটনাশক যেমন : এডমায়ার, ডায়াজিনন অথবা ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

চতুর্থ বছর থেকে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার সময় অনেকটা নির্ভর করে জাতের উপর। এ দেশের উৎপাদিত কাজুবাদামের ফল প্রাপ্তি সময় মে-জুন মাস। তবে বর্ষা শুরুর আগে ফল সংগ্রহ শেষ হলে ফলের গুণাগুণ ও ফলন বেশি পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বয়স্ক প্রতি গাছে ভাল ব্যবস্থাপনায় ৭-১০ কেজি পর্যন্ত কাজুবাদাম পাওয়া যায়। কাজুবাদাম সংগ্রহ করে রোদে একাধারে ৩-৪ দিন শুকিয়ে নিয়ে ছালার বস্তায় ভরে পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

ড্রাগন ফল

পরিচিতি

ড্রাগন ফল ক্যাকটাস দলীয় লতানো গাছ। এটা ক্যাকটাস পরিবারভুক্ত হলেও এ গাছে খরা সহিষ্ণু গুন কম। এটা একটি অতি দ্রুত বর্ধনশীল, তিনশিরা, ক্ষুদ্র কাঁটা বিশিষ্ট লতাগাছ। এই গাছের কোনো পাতা নেই। ড্রাগন ফলের গাছ ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বিগত ৫-৭ বছর ধরে ড্রাগন ফল চাষ 'হাইভ্যালু ফল' হিসাবে এদেশে চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কয়েক বছর ধরে কিছু সংখ্যক ড্রাগন ফলচাষী সফল ভাবে এ নতুন ফল চাষে দক্ষতা অর্জন করায় এটা বর্তমানে অতিলাভজনক ফল হিসাবে চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য দেশের ড্রাগন ফলের চেয়ে বাংলাদেশে উৎপাদিত ড্রাগন ফলের মিষ্টতা অনেক বেশি। যেহেতু এ ফল কম পেরিসেবল, এ জন্য অদূর ভবিষ্যতে ড্রাগন ফল ব্যাপক হারে চাষ করে তা বিদেশে রপ্তানী করার সুযোগ অনেক বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত ড্রাগন ফলের নতুন জাতটি হলো বারিড্রাগনফল-১ যা দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়াতে জনপ্রিয় ফল। এ ফলের আকার বড়, পাকলে খোসার রং লাল হয়ে যায়, শাঁস গাঢ় গোলাপী, লাল ও সাদা রঙের এবং রসালো প্রকৃতির। ফলের বীজ গুলো ছোট ছোট কালো ও নরম। একটি ফলের ওজন ১৫০ গ্রাম থেকে ৬০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ড্রাগন ফল সাধারণত তিন প্রজাতির হয়ে থাকে-

১) লাল ড্রাগন ফল "বাপিটাইয়া"। এর খোসার রঙ লাল ও শাঁস সাদা। এই প্রজাতির ফলই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

২) কোস্টারিকা ড্রাগন ফল। খোসা ও শাঁস উভয়ের রঙই লাল।

৩) হলুদ রঙের ড্রাগন ফল। এই জাতের ড্রাগন ফলের খোসা হলুদ রঙের ও শাঁসের রঙ সাদা।

জাত

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত জাত গুলো হলো-

১) বারিড্রাগন ফল-১

২) বাউড্রাগন ফল-১ (সাদা), বাউড্রাগন ফল-২(লাল)

৩) বাউড্রাগন ফল-৩

পুষ্টিগুণ

ফলটি ভিটামিন-সি, মিনারেল এবং উচ্চ ফাইবারযুক্ত। এটিতে ফ্যাট, ক্যারোটিন, প্রচুর ফসফরাস, এসকরবিক এসিড, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য ড্রাগন ফলে যে পুষ্টিমান পাওয়া যায় তা দেওয়া হলো-

- পানি- ৮০-৯০ গ্রাম
- শর্করা- ১০-১২ গ্রাম

- প্রোটিন- ১-১.৫ গ্রাম
- আঁশ- ২-৩ গ্রাম
- খাদ্যশক্তি- ৩৫-৫০ কিলোক্যালরি
- চর্বি- ০.৪-০.৬ গ্রাম
- ক্যালসিয়াম- ৬-১০ মি.গ্রাম
- আয়রন- ১.৩-১.৯ মি.গ্রাম
- ফসফরাস- ১৬-৩৫ মি.গ্রাম
- থিয়ামিন, রাইবোফ্লাবিন ও নিয়াসিন সামান্য
- ভিটামিন-সি - ২০-২২ মি.গ্রাম

ড্রাগন ফলের গুরুত্ব

- এটি ক্যারোটিন সমৃদ্ধ থাকায় চোখ ভালো রাখে।
- আঁশের পরিমাণ বেশি থাকায় হজমে সহায়তা করে। এছাড়া আঁশ শরীরের চর্বি কমায়।
- এই ফলে বিদ্যমান প্রোটিন শরীরের যাবতীয় বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে।
- এর ক্যালসিয়াম হাড় শক্ত ও দাঁত মজবুত রাখে।
- ভিটামিন বি-৩ রক্তের কোলেস্টেরল কমায় এবং ত্বক মসৃণ রাখে।
- ভিটামিন-সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক, দাঁত ও চুল ভালো রাখতে সাহায্য করে।
- এক বিঘা জমি থেকে প্রায় ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে কৃষকরা প্রায় ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারেন।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারি উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে এবং জৈব সারযুক্ত দো-আঁশ মাটি ড্রাগন ফল চাষের জন্য অনুকূল।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণ সময়

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোটো করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোরায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। সাধারণত এ ফল চাষে ১২-১৩ ফিট দুরত্ব দেয়া হয়। তাতে হেক্টর প্রতি ৮৩৩-১১০০ টি মাদা তৈরী বা কাটিং রোপন উপযোগী পিলার স্থাপন প্রয়োজন হয়। কাজেই মাদার মাঝখানে কংক্রিট দিয়ে তৈরী ৭-৮ ফিট লম্বা শক্ত পিলার বাউনী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ পিলারের ডায়ামিটার হবে ১০-১৫ সে.মিটার। পিলার সরেজমিন থেকে ৫-৫.৫ ফিট উপরে থাকবে এবং ২-২.৫ ফিট মাটির নিচে শক্তভাবে এ পিলার পুঁতে দেয়া হয়। সাধারনত ড্রাগন ফল চাষের জন্য তৈরী মাদার গর্তের মাপ হবে চওড়ায় ২.৫-৩ ফিট ও প্রায় ৮ ইঞ্চি গর্ত করে জমির মাটির সাথে প্রয়োজনীয় সার মিশিয়ে দিতে হয়। প্রতিটি খুঁটির মাথাই একটি করে মটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে কিংবা সিমেন্টের তৈরী বলইও ব্যবহার করা যেতে পারে। পিলার বসানোর ১০-১৫ দিন পর সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষঢ়ভূজাকার পদ্ধতিতে পিলারের চারপাশে ৪-৬ টি ড্রাগন ফলের কাটিং রোপণ করা যায়। ড্রাগন ফল রোপণের জন্য উপযোগী সময় হলো মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য অক্টোবর।

ট্রেনিং প্রুনিং

চারা বারন্ত অবস্থায় মূল শাখা থেকে যে সব কুশি গজাবে তা হতে সবচেয়ে বড় সুস্থ মাত্র একটা ডালকে বাড়তে দিতে হবে। এ মূল শাখা তে নতুন কোনো ডাল গজালে শুরুতেই তা ছেঁটে দিতে হবে। একটি গাছে ১২-১৫ টি কুশি নির্বাচন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ডগা সময়মত ছেঁটে ফেলে শুধু স্বাস্থ্যবান বয়স্ক ডগা রাখতে হবে। ফুল ধরার পর নতুন করে আর কুশি হতে দেওয়া যাবে না, নতুবা ফল ভালো হবে না অথবা ফুল ঝরে যাবে। আবার ২ বছরের পুরাতন ডগা ছাঁটাই করতে হবে।

মালচিং

শুকনা মৌসুমে অবশ্যই গাছের গোড়ার চারদিকে শুকনা কচুরীপানা বা খড়কুটো, লতাপাতা দিয়ে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। মালচিং দেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সে.মিটার দূরত্বে দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় গাছের গোড়া ঠান্ডা থাকবে, আগাছা দমন হবে, গাছের শিকড় বাড়তে অনুকুল পরিবেশ পাবে, মাটিতে রস সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে এগুলো পঁচে জৈব সার হিসাবে গাছের খাবারের উপযোগী হবে। মালচিং দেয়ার পরে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে এতে শিকড় সুস্থ ও ভাল থাকে। উদ্ভিদের চারপাশে নিয়মিত (প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার) মালচিং করা গুরুত্বপূর্ণ।

পানি সেচ ও নিকাশ

দু'সারির মাঝ বরাবর অগভীর নালা কেটে বাড়তি পানি বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বাগানের মাটিতে রসের অভাব দেখা দিলে তৈরী এ নালার মাধ্যমে ৭-৮ দিনের ব্যবধানে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে বর্ষাকালে সেচ দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল হওয়ায় পানির অপচয় কম। অত্যধিক জল এড়ানো উচিত কারণ এটি ফল বিভাজন, ফুল-ফোঁটা, গাছের হলুদ হওয়া এবং ধীরে ধীরে অঙ্কুর বিনাশের কারণ হতে পারে।

সার প্রয়োগ

গাছের বৃদ্ধি ও বেশি ফল পেতে অবশ্যই বাগানে প্রচুর সার প্রয়োগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তিন মাসের ব্যবধানে বছর ভিত্তিক বাগানে যে সব সার প্রতি মাদার গাছের জন্য যে পরিমান বিভন্ন প্রকার প্রয়োগ করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

সারের নাম	ড্রাগন গাছে বয়স ভিত্তিক সার প্রয়োগ (বছর)			
	১-২	৩-৪	৫-৬	৬ বছরের উর্দ্ধে
গোবর/জৈবসার (কেজি)	১৬	২০	৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৫০০	৭৫০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	৩০০	৫০০	৮০০	১০০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৬০০	৯০০	১২০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	১৫০	২০০	২০০

পোকা মাকড়

অন্যান্য ফলের তুলনায় ড্রাগন ফলে পোকা মাকড় এর উপদ্রব খুব কম। সাধারনত মাঝে মাঝে যে সব পোকার উপদ্রব দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে মিলিবাগ, পিঁপড়া, বিটেল, স্কেল ইনসেক্ট, ক্যাটারপিলার, উইপোকা, ইঁদুর, বাদুড় এবং পাখি অন্যতম। ড্রাগন বাগান নিয়মিত দেখাশোনা বা মনিটরিং এর মাধ্যমে এগুলো চিহ্নিত করে সময়মত অনায়াসে দমন ব্যবস্থা নেয়া যায়।

রোগও বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলে রোগ বালাই খুবই একটা চোখে পরেনা। তাবে কখনো কখনো এগাছে মূলপঁচা, কান্ড ও গোড়া পঁচা রোগ দেখা যায়। ছত্রাকনাশক দিয়ে দমন করা যায়। আগাছা সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে।

পরাগায়ণ কৌশল

উদ্ভিদটি শুধুমাত্র রাতে ফুল ফোটায়, যা পরাগায়ণের প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, হাতের বা কৃত্রিম পরাগায়ণের কৌশল দিয়ে এর বৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়া হতে পারে। অথবা ফ্যানের বাতাস দিয়েও পরাগায়ণ করা যায়। পরাগায়ণ সাধারনত রাতের সময় করা হয়।

ড্রাগন ফল সংগ্রহ ও ফলন

ড্রাগন ফলের কাটিং থেকে চারা রোপনের পর রোপনের ১৮ থেকে ২০ মাসের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল যখন সম্পূর্ণ লাল রঙ ধারণ করে তখন সংগ্রহ করতে হবে। গাছে ফুল ফোটার মাত্র ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। বছরে ৫-৬টি পর্যায়ে ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রথমত জুন-অক্টোবর, দ্বিতীয় ডিসেম্বর-জানুয়ারি। প্রতিটি গাছের প্রায় ১০ থেকে ১৫ কেজি তাজা ফল পাওয়া যায়। ভালো ব্যবস্থাপনায় ও উন্নত জাত ব্যবহারে হেক্টর প্রতি ফলন হবে ১৫-২০ টন।

এভোগাডো

পরিচিতি

এভোকাডো হলো মাঝারি আকারের বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বৃক্ষ। বাংলাদেশে যে সব বিদেশী ফলের চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তার মধ্যে এভোকাডো অন্যতম। অন্যান্য ফলের তুলনায় এ ফলের মিষ্টতা কম হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইহা অতি উপযোগী। এ ফলের আকার অনেকটা পেয়ারা বা নাশপাতির মত। একেকটা ফলের ওজন প্রায় ৩০০-৭০০ গ্রাম হয়। ফলের ভিতরে বেশ বড় ডিম্বাকার বীজ থাকে। আহার্য্য অংশ মাখনের মত মসৃণ, হালকা মিষ্টি স্বাদের। একই কারণে অনেকের নিকট ইহা মাখন ফল নামে পরিচিত। পেঁপের মত কাঁচা-পাকা ফল, সবজি, ভর্তা, সালাদ, সরবতসহ ভিন্নতর ভাবে খাওয়ার সুবিধা আছে। বরেন্দ্র এলাকা এভোকাডো চাষের জন্য উপযোগী এবং একটি সম্ভাবনার ফল। বরেন্দ্র এলাকায় এগুলো আকারে ছোটো হবে তবে ফলন ভাল হবে। বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক ফল অনুরাগী এভোকাডো ফল চাষে অতি আগ্রহী হচ্ছে।

জাত

পৃথিবীতে শতাধিক জাতের এভোকাডো ফল চাষ করা হয়ে থাকে। জাতগুলোকে তিনটা রেসে বা গোত্রে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো:

(ক) মেক্সিকান,
(খ) গুয়াতেমালা এবং
(গ) ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান প্রজাতি।

এভোকাডো উৎপাদনকারী দেশগুলোতে যে সব জাতের আবাদ প্রচলন বেশি সেগুলোর মধ্যে হ্যাস, ফুয়ার্টে, বেকন, রীড, পুলোক, জুটানো, জান, লিন্ডা, নাবাল অন্যতম।

পুষ্টি উপাদান

পুষ্টিবিদদের মতে, প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকর উপাদানসমৃদ্ধ ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে এভোকাডো। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, বি, সি, ই এবং কে। এছাড়া এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কপার, পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসের মতো খনিজ উপাদান। এভোকাডোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম আছে, যা কলার চেয ৬০ ভাগ বেশি। এছাড়াও আছে ১৮ ধরনের অ্যামাইনো এসিড ও ৩৪% স্যাচুরেটেড ফ্যাট।

এভোকাডোর ব্যবহার

১. কাঁচা এভোকাডো ফল মাংসে সবজি হিসাবে সালাত ও শরবত হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
২. ফলটিতে চিনির পরিমাণ কম বিধায় ডায়েবেটিস রোগীরা অনায়াসে খেতে পারেন।
৩. উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভালো কোলেস্টেরল আছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমায়।
৪. এই ফলটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করে থাকে। এটি শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে সাহায্য করে।
৫. এটি শিশুদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট মানের খাবার যা শিশুদের পুষ্টি শোষণে সহায়তা করে।
৬. যকৃতকে সুরক্ষা দেয় এবং জন্ডিস প্রতিরোধে সহায়তা করে।
৭. ফলটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন হওয়ায় একে মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে ধরা হয়।
৮. এতে রয়েছে নানা ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ত্বকে অকালে বয়সের ছাপ পড়া প্রতিরোধ করে।
৯. অ্যাভোকাডোতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
১০. এতে রয়েছে কলার চেয়েও বেশি পটাশিয়াম যা উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও কিডনির রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
১১. এ ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যআঁশ আছে যা হজমে সহায়তা করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

বংশবিস্তার

বীজের মাধ্যমে খুব সহজেই বংশবিস্তার করা যায়। একটি বীজকে ৪-৬ ভাগ করে কেটে লাগালে প্রত্যেক ভাগ থেকে চারা গজায়। অবশ্য সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাগে ভ্রুণের অংশ থাকতে হবে। ফল থেকে বীজ বের করার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বীজ বপনের আগে বীজের আবরন অপসারণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। অযৌনজনন বা অঙ্গজ পদ্ধতিতেও বংশবিস্তার করা যায়। জোড়কলম বা গ্রাফটিং, গুটিকলম, ভিনিয়ার, টি বাডিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়।

মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু

উষ্ম ও অবউষ্ম মন্ডলীয় আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। দোআঁশ, উর্বর ও বেলে দোআঁশ মাটি এবং উঁচু জায়গাতে এভোকাডো চাষ ভালো হয়। এটি আংশিক অম্ল মাটিতে ভাল হয়। এভোকাডো চাষের জন্য উপযুক্ত PH 5-7। এই ফল চাষের জমি সুনিষ্কাশিত এবং রোদযুক্ত হওয়া উচিত। কারণ এ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এছাড়া লবণাক্ত মাটিতে গাছ ভালো হয় না। এটি চাষের জন্য গড় তাপমাত্রা ১৩-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস হওয়া সবচেয়ে উপযোগী। তবে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলেও এভোকাডো চাষ করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ফুল ও ফল ধারণে ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এটি উৎপাদন হওয়ায় বানিজ্যিভাবে চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

চারা রোপণের জন্য গর্ত

চারা রোপণের জন্য প্রতি গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১৫-১৮ ফিট। চারা রোপণের জন্য ১.৫ ফিট ব্যাসার্ধের গোলাকার গর্ত খনন করতে হবে। পরে গর্তের ২০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ০.৫ ফিট উঁচু করে ডিবি তৈরি করতে হবে। ৭-১০ দিন পরে উক্ত ডিবিতে চারা বা গাছ রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের বারন্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ সার ১ ঃ ১ ঃ ১ অনুপাতে এবং ফুল-ফল ধরা আরম্ভ করলে ২ ঃ ১ ঃ ২ অনুপাতে প্রধান এ তিন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। গাছের বয়স ভেদে প্রতি বছর প্রতিটা গাছে যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় তা নিম্নরূপ ঃ

প্রতি বছরের জন্য সুপারিশকৃত সারগুলো দু-ভাগে করে নিয়ে একেক ভাগ বছরে কমপক্ষে দু'বার প্রয়োগ করতে হয়। এ সারের ৫০% বর্ষার আগে মে-জুন মাসে এবং অপর ৫০% বর্ষা শেষে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গাছে প্রয়োগ করে তাপানি দিয়ে ভাল ভাবে ভেজাতে হয়। এছাড়া অনু খাদ্যের অভাব পুরণে প্রতি বছর গাছের বয়স ভেদে ১০০-২০০ গ্রাম করে ম্যাগসালফেট, জিঙ্ক সালফেট, ফেরাস অক্সাইড ও বোরন সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। মাটির পিএইচ মাত্রা কম হলে ফেরাস সালফেট না দিলেও চলে।

ট্রেনিং-প্রুনিং

ছোট অবস্থায় ট্রেনিং-প্রুনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত কান্ড গঠন করা এবং চার ধারে সমান সংখ্যক ডালপালা ছাড়াতে সহায়ক হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। কোন জাতের গাছ বেশি উপরের দিকে বাড়ে আবার কোন প্রজাতি বেশি ঝোপালো এবং ডালপালা ছড়িয়ে নীচে মাটিকে স্পর্শ করে। সময়মত উপরে বৃদ্ধি রোধ করা এবং অতিরিক্ত ডাল গজালে তা ছেঁটে কমিয়ে দিয়ে গাছে অবাধে আলো-বাতাস চলাচল সুবিধা নিশ্চিত করা ও ফল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তবে বেশি মাত্রায় ছাঁটাই করলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সেচ নিষ্কাশন

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল বিধায় মাটির পানির ধারন ক্ষমতা বেশি তাই এসব এলাকায় এভোকাডো গাছে খুব বেশি সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় এবং অগভীর গর্ত করতে হয়। বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বেশি প্রয়োজন। তবে শুকনা মৌসুমে ৩-৪ সপ্তাহের ব্যবধানে সেচ দেয়া হলে ফল বেশি ধরে এবং ফলের আকার বড় হয়। শুকনা মৌসুমে অবশ্যই খড়কুটো, শুকনা কচুরীপানা, লতাপাতা গাছের চারধারে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু করে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া উত্তম। এ ব্যবস্থায় মাটিতে রস সংরক্ষিত, আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং পরে এগুলো পঁচে জৈব সারের উৎস হিসাবে গাছের প্রয়োজন মেটায়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

এ ফল গাছে প্রধাণত শিকড় পঁচা, পাতায় দাগ পড়া এবং গোড়া পঁচা রোগের উপদ্রব মাঝে মাঝে দেখা যায়। বাগানকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বর্ষকালে যেন কোন মতেই পানি না জমে সে ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে গাছকে নিরাপদ রাখা যায়। এছাড়া কপার মিশ্রণে তৈরী ছত্রাকনাশকসহ অন্য উপযোগী ছত্রাকনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে গাছকে সুস্থ রাখা প্রয়োজন। এভোকাডো গাছে মাইট, মিলিবাগ, স্কেল পোকা ও ফলের মাছি পোকার উপদ্রব মাঝে মাঝে দেখা যায়। এসব পোকার আক্রমণ দেখা গেলে উপযোগী বালাইনাশক স্প্রে করে গাছকে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত এবং ফুল ফোটার পর আরেকবার স্প্রে করতে হবে। চাষ পদ্ধতি থেকে শুরু করে পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন প্রক্রিয়া অনেকটা আম চাষ এর মতই।

ফল সংগ্রহ

প্রধাণত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পুষ্ট বা পাকা ফল পাওয়া যায়। কচি ফলের রঙ অনেকটা সবুজ থাকে, তবে পুষ্ট হলে বা সংগ্রহ উপযোগী হলে ফলের রং পরিবর্তন হয়ে হালকা সবুজ বা কিছুটা ধুসর বা বাদামী রং ধারন করে। এ দেশে ফল পুষ্ট হতে ৫-৬ মাস সময় লাগে, অথচ অন্য দেশগুলোতে এভোকাডো ফল পাকতে ৮-১০ মাস সময় লাগে। অন্য ফলের ন্যায় গাছে ফল পেকে ঝরে পড়ে না। ফল পুষ্ট হলে ফলের রঙে কিছুটা পরিবর্তন আসে। পুষ্ট ফল পেড়ে ঘরে ৫-৭ দিন রাখলে ফল নরম হয়ে আহার উপযোগী হয়। এ ফল দীর্ঘদিন গাছে রাখার সুবিধা আছে। পুষ্ট ফল এক দেড় মাস পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে গাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়। গাছের বয়স ও জাত ভেদে প্রতি গাছ থেকে ২০০-৫০০ টা ফল পাওয়া যায়। এক থোকায় বা বোটায় ১-৪ টার বেশি ফল ধরে না। কোন কোন গাছে অসময়ে ফুল-ফল আসতে দেখা যায়। সংগৃহীত ফল ৫-৬০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা হলে ১.৫-২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

পার্সিমন

পরিচিতি

এটি প্রধানত এশিয়া মহাদেশের ফল। ফলটি দেখতে অবিকল আমাদের দেশের পাকা গাবের মতো। কোনটা আবার পাকা টমেটোর মতো হয়ে থাকে। এটি খুব সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। এ ফলটি পাকলে সবুজ হলুদ রঙ ধারণ করে। প্রজাতি ভেদে হলুদ, কমলা, লাল, বাদামী এমনকি কালচে রঙের পার্সিমনও দেখা যায়। সম্পুর্ণ পাকা ফল গাছ থেকে সংগ্রহের পর পরই খাওয়া যায়। কম পরিপক্ব ফলে বেশী ক্যোষ্টে আঠা (Astrogenic) থাকায় ঘরে কয়েকদিন রেখে নরম হওয়ার পর খেতে হয়।

জাত

ক) আঠাল ও ক্যোষ্টেভাবযুক্ত পার্সিমন ফল

সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় গাছ থেকে সংগ্রহ করার পরই খাওয়া যায়। অল্প পাকা হলে ঘরে কিছুদিন রেখে নরম হলে খাওয়া যায়। অন্যথায় ক্যোষ্টেভাবযুক্ত বেশী আঠালো হয় যার ফলে ফলের মাংসল অংশ খেতে অসুবিধা হয়। ইহা বেশী লালচে বলে একে ব্রাইট রেড/উজ্জ্বল লাল (Bright Red) নামে পরিচিত।

খ) ক্যোষ্টে ও আঠালভাব বিহীন পার্সিমন ফল

এ ফল ঘরে রেখে নরম করার প্রয়োজন নেই। পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করার পর পরই খাওয়া যায়। কেননা, এতে ক্যোষ্টে ও আঠাল ভাব থাকে না। ইহা শ্যারন (Sharon) নামে পরিচিত। এছাড়াও আমেরিকান ও এশিয়ান দু' ধরণের পার্সিমন ফলের গাছ দেখা যায়। আমেরিকান পার্সিমন ফলের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদা। পক্ষান্তরে, এশিয়ান পার্সিমন গাছ উভয়লিঙ্গিক। তবে উচ্চমূল্য জাতসমূহ হলো হাচিয়া, ফুইয়ু ইত্যাদি।

পুষ্টিমান

পার্সিমন ফল খুবই পুষ্টিকর। সম্পূর্ণ কোলেষ্টেরলমুক্ত, ভিটামিন সি ও পটাসিয়াম সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে বিদ্যমান পুষ্টিগুণ নিম্নরূপ ঃ

পুষ্টিগুণাগুণ	পরিমাণ
চর্বি	০.১ গ্রাম
কোলেস্টেরল	০ গ্রাম
পটাসিয়াম	৭৮ মিলি গ্রাম
মোট শর্করা	৮ গ্রাম
প্রোটিন	০.২ গ্রাম
ভিটামনি 'সি'	২৭% (% Daily Value)
লৌহ	৩%

মাটি ও সার

পুর্ণবয়স্ক পার্সিমন রৌদ্রোজ্জ্বল স্থান পছন্দ করে। চারা অবস্থাই এরা আংশিক ছায়া পছন্দ করে। যেকোন মাটিতেই পার্সিমন ফল গাছ জন্মাতে পারে, তবে মাটি অবশ্যই সুনিষ্কাশিত হতে হবে। পলি, বেলে মাটিতেও সেচ পেলে এগুলো জন্মাতে পারে। তবে দোঁয়াশ মাটি উত্তম। হালকা অম্লীয় মাটি পছন্দ করে। সাধারণত pH ৬-৬.৫ মাত্রা -এ এরা ভাল জন্মে। তবে

pH মাত্রা ৭.৫ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, এর বেশী হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। গভীরমূলী পার্সিমন ফলের গাছে প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হয়। চারা রোপনের পর চারা বৃদ্ধি শুরু না হওয়া পর্যন্ত কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যাবে না। এর গাছ খুব অম্লীয় কিংবা বেশী ক্ষারীয় মাটি পছন্দ করে না।

গর্ত তৈরী ও চারা রোপন

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোটো করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোরায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। সাধারনত পার্সিমন চাষের গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ১০-১৫ ফিট রেখে নির্দিষ্ট স্থানে অন্তত ১.৫ ফিট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তাকার এবং ১ ফিট গভীর গর্ত করে নিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় সব সার ও উপরের উর্বর মাটি দিয়ে সরজমিন থেকে ০.৫ ফিট উঁচু ডিবি করে চারা বপন করতে হয়। চারা রোপনের সময় শিকড় বল যাতে না ভাঙ্গে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সতর্কতার সাথে শিকড় বল জমির সমতলে স্থাপন করে চারিদিকে ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে হালকা পানি দিয়ে বপন করতে হবে এবং শক্ত ঠেসকাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

বংশবিস্তার

নিম্নবর্ণিত উপায়ে এর বংশবিস্তার করা যায় ঃ

- বীজ থেকে।
- গ্রাফটিং এর মাধ্যমে।
- গুটি কলমের মাধ্যমে।
- কাটিং এর মাধ্যমে।

প্রুনিং

সঠিক আকৃতি আনার জন্য পার্সিমন ফল গাছের প্রুনিং প্রয়োজন। চার থেকে ছয় বছরে এ কাজটি করা হয়। বাতাসের তোড়ে যাতে শাখাগুলো ভেঙ্গে না যায়, তার জন্য পার্শ্ব শাখাগুলো কয়েকটি একত্রে বেঁধে রাখা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ভিতরের পাতলা ও দুর্বল শাখাগুলো ছেঁটে দেয়া হয়। প্রায় ২-৩ মিটার কান্ড রেখে পার্শ্ব শাখা ছেঁটে দেয়া হয় যাতে ভিতরে আলো বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে, এতে ফলন বাড়ে। ভালমানের ও বড় আকারের ফল উৎপাদন করতে হলে কিছু ছোট ও ঘন ফল ছেঁটে দেয়া হয়, যাতে অন্য ফলগুলো আকারে বড় এবং উন্নতমানের হয়।

পরিচর্যা

পার্সিমন ফল গাছ কিছুটা খরা সহনশীল। তবে ফল ধরার সময় নিয়মিত সেচ প্রদান করলে ফলের আকার ও গুণগতমান ভালো হয়। খরা মৌসুমে মাটিতে রস ভেদে ১৫-২০ দিন পর পর হালকা সেচই যথেষ্ট। দীর্ঘসময় খরা থাকলে পাতা ও ফল উভয়ই ঝরে যেতে পারে। বেশী দিন জলাবদ্ধতা থাকলে শিকড় পঁচে গাছ মারা যেতে পারে, কাজেই সুনিষ্কাশিত জমিতে পার্সিমন রোপণ করতে হবে।

রোগ-বালাই

পার্সিমন ফল গাছে বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাই দেখা যায় যথা- ডগা শুকানো রোগ, শিকড় পঁচা, বট্রাইটিস, এ্যানথ্রাকনোজ ইত্যাদি।

পোকা-মাকড়

পার্সিমন ফল গাছে অনেক ধরনের পোকা-মাকড় আক্রমন করে থাকে। সেগুলো হোলো- পার্সিমোনের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, ফলের মাছি পোকা, স্যানজোস স্কেল পোকা, পাখী, বোলতা, মিলিবাগ, সাদা মাছি, উইগ, হানিডিউ মথ প্রভৃতি।

ফল সংগ্রহ

সাধারনত সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের শুরুতে পার্সিমনের ফল পাকে। এর গড় ফলন ১৫ মে.টন/হে:। অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের অব-উষ্ণ আবহাওয়াতে সর্বোচ্চ ২০.৪ মে.টন/হে: ফলন পাওয়া গেছে। বিদেশ থেকে এনে বাংলাদেশে নাটোর এবং বান্দরবনে পার্সিমনের ফল গাছ রোপন করা হয়েছে এবং এতে ফল আসাও শুরু হয়েছে যা গুনগতভাবে খুবই ভাল। আশা করা যায়, বরেন্দ্র এলাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় এর চাষ শীঘ্রই সম্প্রসারিত হবে।

কমলা

পরিচিতি

লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে কমলা একটি জনপ্রিয় ফল। থাই-২ ও কাম্মেরি কমলা মিষ্টি, সুস্বাদু, সুগন্ধি এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। কমলা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Citrus reticulate* ও ইংরেজি নাম Mandarin Orange, Mandarin Ges Mandarine| Rutaceae cwievi এবং Citrus গোত্রের ভুক্ত। কমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল হওয়ায় সর্দিজ্বর ও বমি নিবারক। কমলার শুকানো ছাল অঙ্গরোগসমূহ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে কাজ করে। কমলা দিয়ে জ্যাম, জেলি, জুস তৈরি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে থাই-২ ও কাম্মেরি কমলা চাষ করলে আমাদের দেশেও উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানী নির্ভরতা কমে আসবে। আমাদের দেশে বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলা এ ফল চাষ উপযোগী তবে বরেন্দ্র এলাকাতেও কমলা লেবু চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

চারা উৎপাদন

যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই কমলার বংশবিস্তার করা যায়। কমলার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। কমলার একটি বীজ থেকে একাধিক চারা পাওয়া যায়। বীজ থেকে গাছ হলেও ফল দিতে অনেক দেরি করে থাকে। ফল আকারে ছোট ও টক স্বাদের হয়ে থাকে। তাই অযৌন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা উত্তম। এক্ষেত্রে তুলনামূলক সতেজ ও মোটা চারা Rootstock এবং উন্নত জাতের মিষ্টি কমলা যেমন থাই-২, কাম্মেরী ইত্যাদি scion হিসেবে নির্ধারন করে গ্রাফটিং এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। ভিনিয়ার/ক্লেফট গ্রাফটিং এবং টি-বাডিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারা থেকে ২-৩ বছরের মধ্যেই ফল আসে। এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়।

গর্ত তৈরী ও চারা রোপন

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোটো করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোরায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। সাধারনত কমলা চাষের গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ১০-১৫ ফিট রেখে নির্দিষ্ট স্থানে অন্তত ১.৫ ফিট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তাকার এবং ১ ফিট গভীর গর্ত করে নিয়ে তাতে প্রয়জনীয় সব সার ও উপরের উর্বর মাটি দিয়ে সরজমিন থেকে ০.৫ ফিট উঁচু ডিবি করে চারা বপন করতে হয়। প্রধানত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে হতে আগস্ট) মাস এই সময়ের মধ্যে কমলার চারা রোপণ করতে হবে। চারা মাটির বলয়সহ গর্তে লাগাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারাটি গর্তের মাঝে থাকে। কলমের চারার জোড়া স্থানটি মাটি থেকে ১৫ সেমি উপরে রাখতে হবে। চারা রোপনের সময় শিকড় বল যাতে না ভাঙ্গে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সতর্কতার সাথে শিকড় বল জমির সমতলে স্থাপন করে চারিদিকে ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে হালকা পানি দিয়ে বপন করতে হবে এবং শক্ত ঠেসকাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ভাল ফলন পেতে হলে কমলা গাছে সার প্রয়োগ করা দরকার। সর্বোত্তম মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ), বর্ষার পূর্বে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল থেকে মে) এবং বর্ষার পরে মধ্য ভাদ্র-মধ্য কার্তিক মাসে এই ৩ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। চারা রোপণের ৩-৪ মাস পর গাছ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতা এবং গাছেল অবস্থার উপর বিবেচনা করে সারের পরিমাণ কমবেশি করা যেতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
গর্তে	১০-১৫	-	২০০-২৫০	১০০-২০০
৩-৪ মাস	১২-১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
৫-১২ মাস	১২-১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
১-২ বছর	১২-১৫	৮০-১২০	৮০-১২০	৮০-১২০
২-৩ বছর	১৫-১৮	৩০০-৩৫০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৪-৫ বছর	২০-৩০	৩৫০-৫০০	৩০০-৩৫০	৩০০-৪০০
৬-৭ বছর	৩৫-৫০	৫৫০-৬৫০	৪০০-৫০০	৪৫০-৫০০
৮-৯ বছর	৬০-৮০	৭০০-৮০০	৫৫০-৮৫০	৫৫০-৭০০
১০ তদুর্ধ	৯০-১০০	১০০০-১৫০০	৮৫০-১৪০০	৭৫০-১০০০

উন্নতজাতের কমলা লেবু গাছের সঠিক পরিচর্যা

চারা অবস্থায় কমলা গাছের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চারা গাছ রোপণের পর যখন নতুন পাতা গজাবে তখন বুঝতে হবে চারা গাছের খাদ্য দিতে হবে। অল্প অল্প করে টিএসপি, এমওপি, ইউরিয়া সার গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম দিতে হবে। চারা

রোপনের বয়স যখন ৬ মাস হবে তখন জৈব সার দিতে হবে। বাগানের মাটি কুপিয়ে আগলা করে দিতে হবে। গোড়া থেকে জন্মানো অতিরিক্ত শাখা গজানোর সাথে সাথে কেটে ফেলতে হবে। চারা গাছের নিচের দিকে ছেটে রাখতে হবে। দেড় ফুট উপর থেকে কান্ডের উৎপাদনশীল শাখা বাড়তে দিতে হবে। গাছে মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেটে দিতে হবে। গাছের গঠন ছোটো থেকে সুন্দর ও শক্ত করে তুলতে হবে। কমলা গাছের উপরের দিকের ডাল-পালা কেটে দিয়ে গাছ ঝাপড়া করতে হবে। এতে করে কমলা গাছে বেশি ফল আসবে ফলনও বেশি পাওয়া যাবে। আগাছা থাকলে গাছের বেশ ক্ষতি হয়ে থাকে। গাছের গোড়ায় যেন আগাছা জন্মাতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। গাছের উপর পরগাছা থাকলে তা পরিস্কার করতে হবে।

পানি সেচ

চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে পানি সেচ দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময় নিয়মিত কমলা গাছে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় সেচ দিলে কমলা আকারে বড় ও রসালো হয় থাকে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কমলাগাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে মাটি বাহিত রোগ দেখা দিতে পারে।

রোগ-বালাই ও প্রতিকার

মাছি পোকা

এ পোকা ফল ছোট অবস্থায় ফলের ভিতরে হুল ঢুকিয়ে ডিম পাড়ে। এতে করে ফল নষ্ট হয়ে যায়। মাছি পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করলে সব থেকে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

পাতা ছিদ্রকারী পোকা

এ পোকা পাতার নিচে আঁকা-বাঁকা দাগের সৃষ্টি করে থাকে। এর আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায় ও গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১০ মিলি মেটাসিস্টক্স ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে প্রতিকার পাওয়া যায়।

বাকল ছিদ্রকারী পোকা

এ পোকা বাকলের মাঝে ঢুকে খেতে থাকে এবং আক্রান্ত বাকল শুকিয়ে ডাল বা কান্ড মারা যায়। রিপকর্ড ১০ ইসি কীটনাশক ১০ লিটার পানিতে ২ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে প্রতিকার পাওয়া যায়।

কমলা গান্ধী পোকা

কমলা গান্ধী পোকা ফলের গায়ে ছিদ্র করে ফলের রস চুষে খায়। ছিদ্রস্থানে হলদে রং ধারণ করে ফল ঝরে পড়ে। ম্যালাথিয়ন ০.০৪% অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৫ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে প্রতিকার পাওয়া যায়।

গ্রীনিং

গ্রীনিং রোগাক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ রং ধারণ করে। শিরা দুর্বল হয়ে পাতা কিছুটা কোকড়ানো ও ছোট হয়ে সংখ্যা কমতে থাকে। এ রোগ সাইলিড নামক পোকা থেকে সংক্রমিত হয়। নগস ১০০ ইসি ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ মিশিয়ে স্প্রে করলে প্রতিকার পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ

কমলা গাছে সাধারণত মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-পৌষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) মাসে ফল পাকে। ফলের রং কিছুটা হলদে হলে তা সংগ্রহ করা যায়।

কফি

পরিচিতি

কফি একটি বাণিজ্যিক ফসল। পানীয় হিসাবে চায়ের পরেই কফির অবস্থান। শরীর রিফ্রেশ বা স্বাদের জন্য অনেকেই এটি পান করেন। চা বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলেও আমরা এখনো পর্যন্ত কফি চাষে পিছিয়ে রয়েছি। তবে বাংলাদেশে দিন দিন কফির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মাটি এবং জলবায়ু কফি চাষের জন্য বেশ উপযোগী। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার বাণিজ্যিক কৃষির জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। কফি একটি অর্থকরী ফসল বিধায় এটি চাষ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন হবে তেমনি এটি বহুমাত্রিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ বলে জনগনের পুষ্টি চাহিদাও পূরণ করবে। কফি গ্রহণের ও বিপণনের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও বর্তমানে দেশের পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলায় এটি উৎপাদন হচ্ছে। পাহাড়ী এলাকা বাদে বাংলাদেশের

অন্যান্য এলাকায় ইতোমধ্যে চাষ শুরু হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী ও রংপুর জেলায় এবং টাঙ্গাইলে কফির চাষ শুরু হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা অনেক বেশি ও রপ্তানির সুযোগ রয়েছে বলে এটির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু কফি চাষের অনুকূল তবে ভালো ও উন্নত স্বাদের এবং ঘ্রাণের কফি পেতে এর চাষ সম্প্রসারণের জন্য বরেন্দ্র এলাকায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাত

কফি Rubiaceae পরিবারের একটি ফসল। Coffea গণের ৬০টি প্রজাতির মধ্যে কফির ৩টি প্রজাতি চাষ করা হয়। Arabica, Robusta এবং Liberica। বাংলাদেশে প্রথম দুটি চাষ করা হয়। রোবাস্টা জাতের কফি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় খুব উপযোগী।

জলবায়ু

উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ু তবে ফল পরিপক্ব অবস্থায় শুষ্ক জলবায়ু ভাল। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫০ মিমি হলে কফির বৃদ্ধি ভাল হয়। কফি হালকা ছায়ায় ভালো হয় এবং রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে চাষ করলে সার ও সেচের প্রয়োজন হয়।

মাটি

কফি চাষের উপযোগী মাটি হলো গভীর, ঝুরঝুরে, জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ও হিউমাস সমৃদ্ধ, হালকা অম্লমাটি (পিএইচ ৪.৫-৬.৫)। তবে বেলে-দোঁয়াশ অম্ল মাটি (মাত্রা ৬-৬.৫০) উত্তম। লবনাক্ত মাটি এবং গাছের গোড়ায় দাড়ানো পানি কফি সহ্য করতে পারে না।

চারা রোপন

কফির বীজ ও কলম থেকে চারা তৈরি করা হয়। প্রথমে পরিপক্ব, পুষ্ট, বালাইমুক্ত বীজ সংগ্রহ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ফল থেকে বীজ আলাদা করা হয়। ভালভাবে বীজ শুকিয়ে শুকনো কাঠের গুড়া বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে ছায়াতে ছড়িয়ে রাখা হয়। ৪/৫ দিন পর বীজ আলাদা করে বীজ তলায় বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে বীজ গজিয়ে চারা হয়। ফেব্রুয়ারী- মার্চ মাসে পলিব্যাগে চারা স্থানান্তর করা হয়। মে-জুন মাসে মূল জমিতে গর্ত করে চারা রোপন করা উত্তম। গর্তে জৈব সার এবং সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা ভাল।

গর্ত তৈরী

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোটো করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোরায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। সাধারনত এরাবিকা চারা ৬-৮ ফিট এবং রোবাস্টা ৮-১২ ফিট দূরত্ব বজায় রেখে নির্দিষ্ট স্থানে অন্তত ১.৫ ফিট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তাকার এবং ১ ফিট গভীর গর্ত করে নিয়ে তাতে প্রয়জনীয় সব সার ও উপরের উর্বর মাটি দিয়ে সরজমিন থেকে ০.৫ ফিট উঁচু ডিবি করে চারা বপন করতে হয়। চারা রোপনের সময় শিকড় বল যাতে না ভাঙ্গে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সতর্কতার সাথে শিকড় বল জমির সমতলে স্থাপন করে চারিদিকে ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে হালকা পানি দিয়ে বপন করতে হবে এবং শক্ত ঠেসকাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

ছায়া প্রদানকারী গাছ

কফি গাছ উচ্চ তাপমাত্রা এবং তীব্র সূর্যালোক সহ্য করতে পারেনা। রোবাস্টা জাত কিছুটা সহনশীল হলেও কফি বাগানে ছায়া প্রদানকারী গাছ রোপন করা প্রয়োজন। মান্দার, কড়াই, কাঁঠাল, ডুমুর, সুপারি, পেঁপে প্রভৃতি ছায়া প্রদানকারী গাছ হিসাবে রোপন করা যেতে পারে। কফি চাষের সাথে আন্ত:ফসল হিসেবে পেঁপে, আনারস, গোলমরিচ অনায়াসে চাষ করা যায়।

সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগ জাত, গাছের বয়স, মাটির গুণাগুণ, জলবায়ু আবহাওয়া প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। এরাবিকা জাতের চেয়ে রোবাস্টা জাতে সার কম লাগে। বছরে ৪ বার গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। মার্চ (ফুল ফোটার পূর্বে), মে (ফুল ফোটার পর), আগষ্ট এবং অক্টোবর মাসে গাছ প্রতি প্রতিবার যে পরিমান সার দিতে হবে তা ছকে দেওয়া হল-

সারের নাম	কফি গাছে বয়স ভিত্তিক সার প্রয়োগ (বছর)		
	১	৪	৫-এর উর্দ্ধে
জৈব সার (কেজি)	৫-৬	৫-৬	৫-৬
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০	৩৫	৪৫
টিএসপি (গ্রাম)	১৫	২৫	৩০
এমওপি (গ্রাম)	২০	২৫	৩০

গাছের গোড়া থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা করে সার প্রয়োগ করা ভাল। সেচ দিয়ে মালচিং করে দেওয়া প্রয়োজন। আবার গাছের বাড়-বাড়তি কমে গেলে এবং ফুল ও ফল ধরার সময় ১০ লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম ইউরিয়া, টিএসপি ২০ গ্রাম এবং ১৮ গ্রাম পটাশ মিশিয়ে গাছের পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে।

পরিচর্যা

প্রথম ২/৩ বছর বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ায় মালচিংসহ দুই সারির মাঝে সীম জাতীয় ফসল চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেন সার যুক্ত হবে। এপ্রিল-মে মাসে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। মরা চারার স্থলে নতুন চারা রোপন করতে হবে।

ডাল-পালা ছাটাই

গাছের সঠিক কাঠামো দেওয়াসহ ফলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডাল-পালা ছাটাই জরুরী। একক পদ্ধতিতে ছাটাই করার ক্ষেত্রে মাটি থেকে ১-১.৫০ মি. উচুঁতে কান্ডের শীর্ষ কুড়ি কেঁটে দিতে হবে। এতে ফলধারণ শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ঝোপালো হবে।

বালাই দমন

কফি গাছে পোকা-মাকড় রোগ বালাইয়ের আক্রমন কম হয়। পোকার ক্ষেত্রে মিলিবাগ, গ্রীনবাগ, সাদা কান্ড ছিদ্রকারী পোকা উল্লেখযোগ্য। ম্যালাথিয়ন/কার্বারিল/সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করে পোকা সহজে দমন করা যায়। কফির উল্লেখযোগ্য রোগ হলো পাতার রাস্ট। ০.৫% বর্দো মিক্সার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। তাছাড়া কালো পঁচা, মূল পঁচা, বাদামী ঝলসানো রোগ অনেক সময় দেখা যায়। ০.৫% বর্দো মিক্সার প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ

চারা রোপনের ২-৩ বছর পর থেকে কফি সংগ্রহ করা যায়। এরাবিকা জাতে ফুল ফোটার ৮-৯ মাস এবং রোবাস্টায় ১০-১১ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। পরিপক্ক লাল ফল হাত দিয়ে তোলা হয়। ১০-১৫ দিন পরপর ৪-৬ কিস্তিতে বছরে ২ বার ফল সংগ্রহ করা হয়। একটি গাছ হতে বছরে ১ কেজি ফল পাওয়া যায়। হেক্টর প্রতি ফলন ৭৫০- ১০০০ কেজি।

কফির প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফল সংগ্রহ থেকে শুরু করে কাপে পানযোগ্য কফি পেতে কতগুলো ধাপ সম্পন্ন করতে হবে যা নিম্নরূপ :

১) কফির ফল যখন পাকে গাঢ় লাল বা হলুদ রং হয় তখন এগুলো গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

২) প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রে পৌঁছানোর সাথে সাথেই এর কার্যক্রম শুরু করে দিতে হয় অন্যথায় পচন শুরু হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি ২ ধরনের হয়ে থাকে যেমন শুকনো ও ভেজা পদ্ধতিতে।

শুকনো পদ্ধতি

পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পানি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে এটি করা হয়। কফিগুলোকে সূর্যের আলোতে এটি শুকানো হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত কফি বীজের আর্দ্রতা ১১ শতাংশ হয়। এটি অনেক সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি।

ভেজা পদ্ধতি

পাল্পিং মেশিনের মাধ্যমে উপরের নরম পাল্প ও আবরণ সরানো হয়। এরপর পানির চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় রোটেটিং মেশিনের মাধ্যমে বীজের আকার অনুসারে গ্রেডিং করা হয়। ফার্মেন্টেশনের জন্য এই বীজগুলোকে ১২-২৪ ঘন্টা পানি ভর্তি বিশাল ট্যাংকে রাখা হয়। তারপর বীজের উপরের পাতলা পর্দা সরে যায় ও ভালো পানি দিয়ে ধুয়ে শুকানো হয়।

১) কফি বীজ শুকানো ঃ ভেজা পদ্ধতিতে সংগৃহিত কফি বীজগুলোকে রৌদ্রে রেখে আর্দ্রতা ১১ শতাংশে না পৌঁছানো পর্যন্ত শুকাতে হবে, এই অবস্থার কফিকে পার্চমেন্ট কফি বলে। তারপর ব্যাগে ভরে সংরক্ষণ করতে হবে।

২) কফির হালিং ও পলিশিংঃ হালিং মেশিনের মাধ্যমে পার্চমেন্ট লেয়ার সরাতে হবে বা বাহিরের সম্পূর্ণ শুকনা আবরণ সরাতে হবে। যদিও পলিশিং করলে এর গুণগতমান বাড়ে তবুও এটি করা বাধ্যতামূলক বা জরুরী নয়। আকার ও ওজন দেখে কফি কে গ্রেডিং ও বাছাই করতে হবে। নিশ্চিতভাবে ভালো গ্রীণ কফিগুলো রাখতে হবে রপ্তানির জন্য।

৩) বাছাইকৃত গ্রীণ কফিকে রোস্টিং করে তৈরি করা হয়। সুঘ্রাণযুক্ত বাদামী কফি বীজ যেটা আমরা সুপার সপ বা ক্যাফে থেকে ক্রয় করে থাকি। বেশির ভাগ রোস্টিং মেশিনের তাপামত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রায় ৫৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই সময়ে সঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অতিব জরুরী কারণ এই ধাপেই সৃষ্টি হয় অসাধারণ স্বাদ ও ঘ্রাণ। এই প্রক্রিয়াকে বলে পাইরোলাইসিস। রোস্টিং এর পর অতি দ্রুত ঠান্ডা করতে হবে। তাহলেই এর স্বাদ ও গন্ধ অটুট থাকবে যার জন্য ক্রেতাগণ অনেক বেশি আকৃষ্ট হবে ক্রয়ের জন্য।

৪) কফির স্বাদ ও ঘ্রাণ গ্রাহকের কাপ পর্যন্ত বজায় রাখতে হলে সঠিকভাবে কফি গ্রাইন্ডিং করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কফি বীজ গুড়া করা যত মিহি হবে তত দ্রুত সুন্দর কফি তৈরি হবে।

৫) কফি তৈরি ও গ্রহণঃ আধুনিক বিভিন্ন মেশিনের সাহায্যে ব্ল্যাক কফি বা মিল্ক কফি তৈরি করে কফি প্রেমিদের সন্তুষ্ট করা যায়।

ইজিপশিয়ান ডুমুর

পরিচিতি

ডুমুর মূলত মধ্যপ্রাচ্যের ফল। ডুমুরকে আরবিতে ত্বীন বলা হয়। যার ইংরেজি নাম Fig এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Fiscus carica* বর্তমানে বাংলাদেশে মিশরীয় মিষ্টি ডুমুর চাষ করা করা হচ্ছে। এটি টবেও লাগানো যায়। ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ রং ধারণ করে। তবে পাকলে ধীরে ধীরে বেগুনী রং ধারণ করে। এই ফল নরম ও মিষ্টি স্বাদের।

ডুমুরের জাত

ডুমুরের অনুমোদিত কোনো জাত নাই। তবে বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে যে ডুমুরের যে গাছগুলো হয় সে ডুমুরগুলো হলো জগডুমুর। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus racemosa*। জগডুমুরের বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। এছাড়াও আরেক প্রজাতির মূল্যবান ডুমুর আছে, যেটিকে মিশরীয় ডুমুর (*Egyptian Ficus*) বলা হয়। এটি খুব রসালো ফল ও অনেক বড় হয়। এটি দু'ভাবে খাওয়া যায়। একটি হলো কাঁচায় সরাসরি খাওয়া। অন্যটি হলো রোদে শুকিয়ে কাঁচের কন্টেইনারে রেখে সারা বছর খাওয়া। বাউ জার্মপ্লাজম সেন্টারে মিশরীয় ডুমুরের চাষ করা হয়ে থাকে যার পাঁচটি জাত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে একটি নিউইয়র্কের ভ্যারাইটি, একটি ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যারাইটি ও দু'টি পাকিস্তানের ভ্যারাইটি। আরেকটি উচ্চমূল্যের অপ্রচলিত জাত হলো চায়না ডুমুর।

পুষ্টি উপাদান

ডুমুরে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ১, ভিটামিন বি ২, ছাড়াও প্রায় সব রকমের জরুরি নিউট্রিশনস যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম ইত্যাদি আছে। ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের অভাবজনিত রোগে এটি বেশ কার্যকরী। কার্বোহাইড্রেট, সুগার, ফ্যাট, প্রোটিন, থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন ছাড়াও বিভিন্ন পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ডুমুর। পুষ্টিগুণের পাশাপাশি ডুমুরের অনেক ঔষধি গুণও রয়েছে।

ডুমুরের বংশবিস্তার

ডুমুরের বংশ বিস্তারের অনেক পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে সহজ ও ভালো পদ্ধতি হলো কাটিং। কাটিং পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারে শতকরা প্রায় ৯৮% চারাই টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাটিংয়ের এক মাসের মধ্যেই চারা মূল টবে লাগানোর উপযুক্ত হয়। টবে কাটিং লাগানোর ৪-৫ মাসের মধ্যেই ডুমুর ফল পাওয়া যায়।

মিশরীয় ডুমুরের চাষ পদ্ধতি

মিশরীয় ডুমুরের চারা লাগানোর জন্য ১২-২০ ইঞ্চি মাটির টব বা কালার ড্রাম সংগ্রহ করতে হবে। ড্রামের তলায় ৩-৫ টি ছিদ্র করে নিতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে। ড্রাম বা টবের তলার ছিদ্রগুলো ছোট ছোট ইটের টুকরা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। ড্রাম বা টবের গাছটিকে ছাদের এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে রোদ সবসময় থাকে। এবার ২ ভাগ বেলে দোআঁশ মাটি, গোবর ১ ভাগ, টিএসপি ২০-৪০ গ্রাম, পটাশ ২০-৪০ গ্রাম এবং হাড়ের গুড়া ২০০ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে ড্রাম বা টবে পানি দিয়ে ১০-১২ দিন রেখে দিতে হবে। অতঃপর মাটি কিছুটা খুচিয়ে দিয়ে আবার ৪-৫ দিন একইভাবে রেখে দিতে হবে। মাটি যখন ঝুরঝুরে হবে তখন একটি সবল সুস্থ মিশরীয় মিষ্টি ডুমুরের কাটিং চারা উক্ত টব বা ড্রামে রোপন করতে হবে। চারা গাছটিকে সোজা করে লাগাতে হবে। সেই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি কিছুটা উঁচু করে দিয়ে মাটি হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে হবে। যাতে গাছের গোড়া দিয়ে বেশি পানি ঢুকতে না পারে। একটি সোজা কাঠি দিয়ে গাছটিকে বেধে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর প্রথমদিকে পানি কম দিতে হবে। আস্তে আস্তে পানি বাড়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে আবার বেশি শুকিয়েও না যায়।

ডুমুর চাষের ক্ষেত্রে পরিচর্যা

অন্যান্য ফল গাছের তুলনায় ডুমুর গাছে খুব দ্রুত ফল ধরে। একটি ডুমুরের কাটিং চারা লাগানোর ৪/৫ মাস পর থেকেই ফল দিতে শুরু করে। তাই গাছ লাগানোর ২-৩ মাস পর থেকেই টবের গাছকে নিয়মিত অল্প অল্প করে

সরিষার খৈল পচা পানি দিতে হবে। সে অনুযায়ী ১০-১৫ দিন পর পর সরিষার খৈল পচা পানি প্রয়োগ করতে হবে। সরিষার খৈল গাছে দেওয়ার কমপক্ষে ১০ দিন আগেই পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে সেই পচা খৈলের পানি পাতলা করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। ১ বছর পর টবের আংশিক মাটি পরিবর্তন করে দিতে হবে। ২ ইঞ্চি প্রস্থে এবং ৬ ইঞ্চি গভীরে শিকড়সহ মাটি ফেলে দিয়ে নতুন সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে তা ভরে দিতে হবে। টবের মাটি পরিবর্তনের কাজটি সাধারণত শীতের আগে ও বর্ষার শেষ করাই ভালো হয়। টব বা ড্রামের মাটি ১০-১৫ দিন পর পর কিছুটা খুঁচিয়ে দিতে হবে।

ডুমুর ফলের ব্যবহার

ডুমুর ফলের উপরের আবরণ খুব পাতলা ও নরম। খেতে খুবই সুস্বাদু ও মিষ্টি। পাকা ফল আবরণ সহ সরাসরি খাওয়া যায়। তাছাড়াও পাকা ডুমুর দিয়ে জ্যাম, জেলি, চাটনি ইত্যাদি তৈরি করে খাওয়া যায়। পাকা ডুমুর শুকিয়ে বিভিন্ন রকমের খাবারের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাঁচা ডুমুর তরকারী হিসেবে খাওয়া যায়।

রোগ নিরাময়ে ডুমুর

ডুমুর কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সহায়তা করে। ডুমুর দেহের ওজন কমানো, পেটের সমস্যা দূর করা এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখাসহ নানা উপকার করে থাকে। মৃগীরোগ, প্যারালাইসিস, হৃদরোগ, ডিপথেরিয়া, প্লীহা বৃদ্ধি ও বুকের ব্যথায় ডুমুর কার্যকরী। ডুমুর শরীরে এসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। শরীরে পিএইচের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। ডুমুর পাতা ডায়াবেটিক রোগীদের ইনসুলিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালের নাশতার সঙ্গে ডুমুরের পাতার রস খেতে হবে। ডুমুর ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও ডুমুর গাছের কষ পোকার কামড় বা হুল ফুটানো ব্যথা নিরাময়ে কার্যকরী।

আলুবোখরা

পরিচিতি

আলুবোখারা বা প্লাম (*Prunus domestica*) রোজেসি (Rosaceae) পরিবারভুক্ত বাংলাদেশের স্বল্প ব্যবহৃত একটি উচ্চমূল্যের ফল জাতীয় মসলা ফসল। এটি পিচ, চেরী ও বার্ত চেরী এর সমগোত্রীয় ফল প্রধানত মসলা হিসাবে ও আচার বা চাটনীতে ব্যবহার করা হয়। শুকনা আলুবোখারা (যা প্রুন নামে পরিচিত) মিষ্টি, রসালো এবং এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। পাকা ফল ডিপ ফ্রীজে সারা বছর রেখে তা থেকে সরবত বা চাটনি তৈরি করে খাওয়া যায়।

আবহাওয়া ও মাটি

সাধারণত শীত প্রধান ও অবউষ্ণ আবহাওয়া আলুবোখারা চাষের জন্য উপযোগী। তার ০-৭.২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলুবোখারা রৌদ্র উজ্জ্বল আবহাওয়া ও সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী পর্যাপ্ত সূর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে আলুবোখারা চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলুবোখারা চারা রোপণ করা যায়।

বংশ বিস্তার

বীজ থেকে উৎপাদিত চারা বা কলমের মাধ্যমে আলুবোখারার বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। মাতৃ গাছের গুণগত মান বজায় রাখা ও দ্রুত ফলন পাওয়া যায় বলে কলমের চারাই উত্তম। ২,০০০-৪,০০০ পিপিএম মাত্রার ইনডোল বিউটাইরিক এসিড (আইবিএ) প্রয়োগে গুটি কলম এর সাফল্য বাড়ে। মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা কলম পাতা ও শাখা ছাটাই করে পলিব্যাগে ২/১ মাস রেখে ভালভাবে শিকড় ও পাতা গজানোর পরে জমিতে লাগানো যেতে পারে। বীজ থেকে উৎপাদিত চারার উপর ক্লেফ্ট বা ভিনিয়ার কলম করে সহজেই কলমের চারা উৎপাদন করা যায়।

মাদা তৈরি

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোট করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোড়ায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১২-১৫ ফিট দূরের সারিতে ১০-১২ ফিট দূরে দূরে ২.৫×২.৫×১.৫ ফিট আকারের গর্ত তৈরি করে উপরের মাটি একপাশে ও নিচের মাটি অন্য পাশে রাখতে হবে। প্রতি গর্তে পচা গোবর অথবা কম্পোস্ট ১০-১৫ কেজি, ৩-৫ কেজি ছাই, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম, জিপসাম ১৫০ গ্রাম, দস্তা ১০ গ্রাম ও বোরন ১ গ্রাম পরিমাণে ভালভাবে উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে উপরের মাটি নিচে আর নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

ভাল উৎপাদন ও আগাম ফলন পেতে আলুবোখারার এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শুকনা মৌসুমে গাছে নিয়মিত সেচ ও আগাছা হলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে আলুবোখারা নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছে সার প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৭বছর	৮-১০ বছর	১০ বছর এর উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া(গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০-৮০০	১০০০
টিএসপি(গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০

সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকানো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

ট্রেনিং প্রুনিং

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্চিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

উচ্চমূল্যের আলুবোখারার জাতে কোন পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়নি। য়েমন বারি আলুবোখারা-১ জাতটিতে রোগবালাই এর আক্রমণ অনেক কম। শুধুমাত্র পাতার দাগ বা লিফ স্পট রোগ দেখা গেছে। ম্যানকোজেব বা এ জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করেই তা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

আলুবোখারার ফল নন-ক্লাইমেক্টরিক হওয়ায় গাছ থেকেই ভালভাবে পাকার পর তা সংগ্রহ করতে হয়। আলুবোখারার ফল ভালভাবে পেকে গাঢ় লাল বা হালকা খয়েরী রং ধারণ করলে এবং ফল নরম হলেই সংগ্রহ করা উচিৎ। হেক্টরপ্রতি ৭ থেকে ১০ টন ফ্রেশ পাকা ফল পাওয়া যেতে পারে। যা থেকে হেক্টর প্রতি ২৮-৪০ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। অত্যন্ত টক বা হালকা তেতো স্বাদেরও হতে পারে। বারি আলুবোখারা -১ এর বা এ জাতের প্রতি পূর্ণ বয়স্ক (১০-২০ বছর) গাছে দেড় থেকে তিন হাজার পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে।

লংগান

পরিচিতি

লংগান আমাদের দেশে আঁশফল বা কাঠ লিচু নামে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Euphoria longana* এবং স্যাপিন্ডেসি (Sapindaceae) পরিবারভুক্ত একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। লিচু ও রাম্বুতান একই পরিবারের সদস্য। লংগান আমাদের দেশের স্থানীয় ফল হলেও গুণগতমান তেমন ভালো নয়। ফলের উপরিভাগ মসৃণ, ফলের রঙ বাদামি, আকার গোল এবং লিচুর চেয়ে অনেক ছোট হলেও ফলের শাঁস অবিকল লিচুর মতো এবং ফল খেতে প্রায় লিচুর মতো বা লিচুর চেয়ে বেশি মিষ্টি। এ ফলের শাঁস সাদা, কচকচে। আঁশফলের বীজ গোলাকার চকচকে কালো এবং শাঁস বীজকে আবৃত করে রাখে এবং সহজেই বীজ থেকে আলাদা করা যায়। সম্প্রতি লংগান ফল দুটি বাংলাদেশে

সাফল্যজনকভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে লংগানের বেশ কিছু উন্নতমানের জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র এলাকায় সরকারিভাবে উন্নতমানের জাত আমদানির মাধ্যমে উচ্চমূল্যের চারা জনপ্রিয়করনের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বিতরন করে বাগান সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

পুষ্টিমান ও ঔষধিগুণ

লংগানে বিভিন্ন খনিজ উপাদান, শর্করা ও ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৭২ ভাগ পানি, ১০৯ কিলোক্যালোরি শক্তি, ৮.০ মিগ্রা. ভিটামিন সি, ২৮০ আইইউ ভিটামিন এ, ২.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ৬.০ মি.গ্রা. ফসফরাস, ১.০ গ্রাম প্রোটিন ও ০.৫ গ্রাম ফ্যাট বিদ্যমান। লংগানের শুকানো শাঁস ভেষজ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- এটি পাকস্থলীর প্রদাহে, অনিদ্রা দূর করতে ও বিষের প্রতিষেধক (antidote) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা অ্যালার্জি, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও কার্ডিওভাসকুলার রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা যায়।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি আঁশফল-১ এবং ভিয়েতনাম থেকে প্রবর্তিত জার্মপ্লাজম থেকে বারি আঁশফল-২ নামে আঁশফলের দুটি উন্নত জাত বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের জন্য মুক্তায়ন করেছে। এ জাত দুটি প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। তবে উচ্চমুল্যের উন্নতজাতের লংগান হচ্ছে থাই, রুবি, কিং প্রভৃতি। বরেন্দ্র এলাকায় এসব জাতগুলোর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে জনপ্রিয়করণের উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে সহজেই চারা তৈরি করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত গাছ হুবহু মাতৃ গুণাগুণ বহন করে না এবং ফল ধরতে দীর্ঘ সময় (৭-৮ বছর) লাগে। অঙ্গজ বংশবিস্তারই লংগানের জন্য অনুমোদিত বংশবিস্তার পদ্ধতি। গুটি কলম হচ্ছে অঙ্গজ বংশবিস্তারের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রচলিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সফলতার হার বেশি (৮০-৯০%)। তবে গুটিকলমের মাধ্যমে তৈরি গাছের শিকড়ের বিস্তার কম থাকায় এবং প্রধান মূল নাথাকায় সহজেই বাতাসে উপড়ে যায়। অপরদিকে একটি গাছ হতে অল্প কয়েকটি গুটি কলম করা যায়। তাই গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে চারা তৈরি করা উত্তম। সাধারণত ৮-১২ মাস বয়সের লংগানের চারা রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মে-জুন মাসে কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ হতে ৪-৫ মাস বয়স্ক সায়ন সংগ্রহ করে ফাটল (Cleft grafting) পদ্ধতিতে জোড়া লাগানো হলে সফলতা ও কলমের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং এ পদ্ধতিতে উৎপন্ন কলম হতে ৩-৪ বছরে ফল পাওয়া যায়।

উৎপাদন কলাকৌশল

জমি নির্বাচন ও তৈরি

লংগান চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি উত্তম। জমি নির্বাচন করে চাষ ও মই দিয়ে এবং দীর্ঘজীবী আগাছা সমূলে অপসারণ করে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে।

চারা-কলম নির্বাচন

রোপণের জন্য এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা নির্বাচন করতে হয়।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তকার বা ষড়ভূজি পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই আঁশফলের চারা-কলম রোপণ করা চলে।

গর্ত তৈরি

বরেন্দ্র এলাকার মাটি এঁটেল মাটি বিধায় গর্ত যথাসম্ভব ছোটো করায় শ্রেয় এবং অন্তত ০.৫ ফিট উঁচু হিপ করে চারা রোপন করা যেতে পারে যাতে করে চারার গোড়ায় পানি জমে শিকড় পঁচে না যায়। চারা রোপণের ২ সপ্তাহ পূর্বে ১২ ফিট থেকে ১৫ ফিট দূরত্বে চারা রোপন করতে হবে। তবে বরেন্দ্র এলাকার জন্য ঘন করে গাছ লাগানো যেতে পারে। বাগানের লে-আউট তৈরী করে নির্দিষ্ট স্থানে অন্তত ১.৫ ফিট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ১ ফিট গভীর বৃত্তাকার গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈবসার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

চারা-কলম রোপণ ও পরিচর্যা

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটি খাঁড়াভাবে রোপণ করে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হয়। চারা রোপনের সময় পুরাতন লিচু গাছের গোড়া থেকে কয়েক কোদাল মাটি নিয়ে গর্তে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাই। কারন লিচু গাছের গোড়ার মাটিতে অবস্থিত রাইজোবিয়াম নোডিউল ফরমেশন করে বায়বীয় নাইট্রোজেন শোষনে সহায়তা করে। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সঙ্গে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার কোনো ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

গুণগতমানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে লংগানে নিয়মিত সারপ্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। ছোট লংগান গাছগুলিতে জৈব সার ভালো কাজ করে থাকে। জৈব সার হিসেবে গোবর সার ৯ থেকে ১০ কেজি প্রতিটি গাছে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ২ থেকে ৩ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে। লংগান চারা রোপনের প্রথম বছর প্রতি ১.৫ মাস পর পর ১০৯ গ্রাম এনপিকে সার দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় বছর ৩.৫ মাস পর পর ২২৫ গ্রাম সার এবং তৃতীয় বছর প্রতি ৩.৫ মাসে ৪৪৫ গ্রাম সার দিতে হবে। পরিপক্ক গাছে ফুল ফুটার আগে ১.৫-২.১৫ কেজি সারের প্রয়োজন। উষ্ণ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, মলিবডেনাম এবং দস্তার তরল স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই

লংগানে তেমন কোনো পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ হতে দেখা যায় না। তবে ফলের পরিপক্ক পর্যায়ে পাখি (ফিঙে, দোয়েল) ও বাদুড় ফল খেয়ে প্রচুর ফল নষ্ট করে ফেলে। তাই প্রত্যেক গাছ আলাদাভাবে বা সম্পূর্ণ বাগানে নাইলন নেট দিয়ে আবৃত করে ফল রক্ষা করা যায়।

কালো পিপড়া

এ ফল বেশি মিষ্টি বিধায় গাছে থাকা অবস্থায় কালো পিঁপড়া বীজ ও খোসা বাদ দিয়ে ফলের সব শাঁস খেয়ে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা

বাগানের আশপাশে পিঁপড়ার বাসা থাকলে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। সেজন্য মাটিতে ডারসবান ২০ ইসি @ ২ মিলিলিটার বা লরসবান ১৫ জি ৫ গ্রাম/লিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে গাছে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি বা ডারসবান ২০ ইসি ১.৫ মিলিলিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে অবশ্যই কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ) মাসে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র (আগস্ট) মাসে ফল পাকে। সম্পূর্ণ পাকার পর ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আবার ফল বেশি পেকে গেলে গাছ থেকে ঝরে পড়ে ও ফেটে যায়, যা গাছের ফলনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। তাই সময়মতো ফল সংগ্রহ আঁশফলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোকোয়া

গাছ বেশি বড় হয় না। বড়জোড় ২৫ ফুট উঁচু হতে পারে। তবে কোকোয়ার বড় বড় বাণিজ্যিক বাগানে ছাঁটাই করে গাছকে ছোট রাখা হয়। আর বড় বড় ছায়াবীথির নিচে এদের শ্রীবৃদ্ধি চির সবুজ হয়। পাতা একান্তর, ঘন সবুজ ও আয়ত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফোটে গাছের কান্ডে ও ডালে। ফুল ছোট, হালকা গোলাপি ও সাদা। ফলে অনেক শিরা থাকে। আকরে অনেকটা নাশপাতি ফলের মতো। পাকা ফলের ভেতরে পেঁপের মতো ফাঁকা আর পাঁচ সারির ছোট ছোট বীজ থাকে।

চকলেট উৎপাদন

সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ টির মতো বীজ থাকে প্রতিটি ফলে। পাকলে কোনো জাতের ফলের রং হয় মোটা লাল আবার কোনোটার গাঢ় হলুদ। পাকা ফলের ভেতরের বীজ বের করে শুকিয়ে তাকে ফারমেনটেশন বা গাঁজাতে হয়। তারপর তাকে রোস্ট গুঁড়া করতে হয়। এর পাউডার থেকেই চকলেট তৈরি করতে হয়। বছরে দুবার ফল সংগ্রহ করতে হয়। কোকোয়া গাছ শীতল ও গরম হাওয়া কোনোটাই সহ্য করতে পারে না। সে জন্য বড় বড় গাছের সারি দিয়ে কোকোয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়।

খাদ্যগুন

কোকোয়ার বীজে আছে থিওব্রোমাইন, ক্যাফেইন ও রঙিন বস্তু। সার্বিকভাবে বীজ উত্তেজক, মূত্র রোগে উপকারী। থিওব্রোমাইন স্নায়ুবিক রোগের টনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হৃদজনিত রোগে 'এনজাইমা পেক্টোরিস'- এর ব্যাথা উপসম করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও বুকের ব্যাথায় চকলেট পানীয় খেতে দেওয়া হতো। ফলের নরম শাঁস থেকে কোকোয়া- মাখন তৈরি করা হয়। এর প্রলেপ ত্বক কোমল রাখতে সাহায্য করে থাকে।

পিচ ফল

পরিচিতি

পিচ (Prunus persica) তারিম বেসিন এবং কুনলুন পর্বতমালার উত্তর ঢালু অঞ্চলের মধ্যবর্তী উত্তর-পশ্চিম চীনা অঞ্চলের একটি পাতলা গাছ, যা এখানে প্রথম চাষ করা হয়েছিল। এর জন্মস্থান উত্তর চীন হিসাবে বিবেচিত হয়। পিচ ফলটি শীতপ্রধান এলাকায় ভালো জন্মে। ইংরেজি নাম Peach, এই নামেই এদেশেও পরিচিত হয়ে উঠেছে। পিচ গাছ মাঝারি আকারের বৃক্ষ, পাতা অনেকটা ডালিম পাতার মতো দেখতে। পাতার গোড়ায় অনেক ছোট ছোট পাতা থাকে। ফুলের রঙ লাল বা গোলাপি। ফল দেখতে ডিম্বাকার তবে মুখটা আমের মতো বাকানো ও সুচালো। কাঁচা ফলের

রঙ সবুজ পাকলে হালকা হলুদের ওপর লাল আভা সৃষ্টি হয়। কাঁচা ফল শক্ত, খোসা খসখসে। কিন্তু পাকলে নরম হয়ে যায় ও টিপ দিলে সহজে ভেঙে যায়। পাকা ফলের রসালো শাঁস হালকা হলুদ ও ভেতরের দিকে লাল, শাঁসের স্বাদ টক। ফলের মধ্যে খয়েরি রঙের একটা শক্ত বিচি থাকে। পিচ ফল এক কেজি ফল থেকে প্রায় ৪৭০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। পিচ ফল এখন বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই চাষ সম্ভব ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। সাভার, গাজীপুর, সৈদয়পুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকায় বেশ কিছু পীচ ফলের গাছ চোখে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পিচ ফল নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। বরেন্দ্র এলাকায় এটি চাষের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পিচ ফলে বেশ কয়েকটি দরকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এটি ভিটামিন সমৃদ্ধ, এটিতে প্রয়োজনীয় তেল এবং পেকটিন রয়েছে। পিচ ফল রোগে প্রচুর ভোগে। বিভিন্ন পোকামাকড় এবং রোগের উচ্চ সংবেদনশীলতা এর অন্যতম প্রধান অসুবিধা। পিচ ক্লিটারোস্পোরোসিস ও পিচ পাতা কার্ল রোগ বেশি পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে সাধারণ পোকামাকড়গুলো হলো- কোডিং মথ, ডোরাকাটা মথ এবং স্কেল পোকা। আমের বাগানে পীচ ফলের গাছ থাকলে মাছি জাতীয় পোকা আমে আক্রমন না করে সব পীচ ফলে আক্রমন করে বিধায় এটা Trap crop হিসেবে লাগানো যেতে পারে আমের বাগানে। পিচ ফল পাকে মে - জুন মাসে।

পিচ ফল এখন বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই চাষ সম্ভব ও পুষ্টিগুনে সমৃদ্ধ। পাকা রসালো শাস হালকা হলুদ ও ভেতরের দিকে লাল, শাঁসের স্বাদ টক। ফলের মধ্যে খয়েরি রঙের একটা শক্ত বিচি থাকে। উচ্চমূল্য জাত: জায়ান্ট। পিচ ফল পাকে মে-জুন মাসে। এক কেজি ফল থেকে প্রায় ৪৭০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। চোখ কলম করে ফলের বংশবৃদ্ধি সম্ভব।

পোমেলো (জাম্বুরা)

পরিচিতি

জাম্বুরা বা বাতাবি লেবু বা তুরুনজা এক প্রকার লেবু জাতীয় টক-মিষ্টি ফল। বিভিন্ন ভাষায় এটি পোমেলো, জাবং, শ্যাডক ইত্যাদি নামে পরিচিত। কাঁচা ফলের বাইরের দিকটা সবুজ এবং পাকলে হালকা সবুজ বা হলুদ রঙের হয়। এর ভেতরের কোয়াগুলো সাদা বা গোলাপী রঙের। উচ্চমূল্য জাত: থাই (ভিতরে ও বাহিরে লাল)।

মাটি নির্বাচন: লেবু চাষের জন্য উঁচু দো-আঁশ এবং উর্বর মাটির প্রয়োজন। পানি জমে থাকে না এমন মাটি পোমেলো লেবু চাষের জন্য উপযোগী।

সার প্রয়োগ: লেবু গাছের গোড়ায় বছরে ২ বার সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাস আর পরবর্তী পর্যায়ে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে। গাছে নতুন পাতা আসার সময় অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

পরিচর্যা: পোমেলো লেবু গাছের গোড়া সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। অন্যথায় রোগ পোকার আক্রমন বেশি হয়। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় পানি যাতে জমে না থাকে সেদিকে বেশি করে লক্ষ্য রাখতে হয়। এ জন্য নালা করে পানি সরে যাওয়ার পথ করে দিতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পোমেলো লেবু গাছের শুকনো এবং রোগাক্রান্ত ডালগুলো কেটে ফেলতে হবে।

মালবেরি বা তুঁত

তুঁত গাছের পাতা প্রাথমিক ভাবে রেশম পোকাকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এটির ঔষধি গুনাগুন সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না। তুঁতের কয়েকটা প্রধান ঔষধি ব্যবহার হল- রক্তের টোনিক তৈরি, মাথা ঘোরা, কোষ্টকাঠিন্য, টিনটাস, মূত্রথলিজনিত সমস্যার সমাধানে ব্যবহার হয়। উচ্চমূল্য জাত: হিমালয়ন লং সাদা ও লাল।

মাটির ধরণ: উর্বর সুনিস্কাশিত সমতল জমি এবং যে মাটির পানি ধারণক্ষমতা ভাল। মাটির পিএইচ ৬.২-৬.৮ হওয়া ভাল।

জমি প্রস্তুত: তুঁত গাছের চারা রোপনের জন্য ভালভাবে মাটি প্রস্তুত প্রয়োজন। প্রথমে জমি থেকে আগাছা ও পাথর সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মাটিকে গভীরভাবে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা উচিত। রোপন: প্রধানত জুলাই-আগষ্ট মাসে তুঁত গাছের চারা রোপন করা হয়।

চারা থেকে চারার দূরত্ব: ৯০সেমি×৯০সেমি। গর্তে রোপনের গভীরতা ৬০ সেমি হওয়া উচিত।

বীজের হার: প্রতি একরে ৪ কেজি।

সার ব্যবহার: জৈব সার প্রতি একরে ৮ মে. টন। ভি-১১ জাতের জন্য এনপিকে ১৪৫:১০০:৬২ কেজি/একর/বছর এবং এস-৩৬ জাতের জন্য এনপিকে ১২৫:৫০:৫০ কেজি/একর/বর্ষ।

আগাছা দমন পদ্ধতি: প্রাথমিক পর্যায়ে জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এতে করে গাছের ভাল বৃদ্ধি ও ফলন হবে।

সেচ পদ্ধতি: সপ্তাহে একবার ৮০-১২০ মিমি সেচ দিতে হবে। যখনই ওই অঞ্চলে পানির অভাব দেখা দিবে সাথে সাথে ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দিবেন। এই পদ্ধতি ৪০% পানি বাঁচাতে সহায়তা করে।

কাষ্টার্ড আপেল

এটি আতা, শরিফা, মেওয়া এবং নোনা ফল নামে পরিচিত। এই গাছের উচ্চতা বেশি (প্রায় ১০ মিটার) হয়ে থাকে। উচ্চমূল্য জাতসমূহ: গোল্ডেন, বারমাসি।

মাটি ও জলবায়ু: আতাফল বা শরিফা ফল চাষে উচুঁ জমি নির্বাচন করতে হবে যে জমিতে পানি উঠে না এমন জমি। বসতবাড়ির খোলা যায়গায় এবং অল্প ছায়াযুক্ত স্থানেও আতা শরিফা চাষ করা যায়। বেলে দোআঁশ মাটিতে ও সবসময় রোদ থাকে সে স্থানে সবথেকে ভাল ফলন পাওয়া যায়। শুস্ক ও গরম পরিবেশে আতা গাছ ভাল হয়।

চারা তৈরি: সাধারণত বীজ থেকে শরিফার চারা তৈরি করা হয়ে থাকে, তবে বর্তমানে কলমের মাধ্যমে ও চারা তৈরি করা হচ্ছে। কলমের গাছে ছয়মাস থেকে এক বছর বয়সে ফল আসা শুরু করলেও বীজের চারা থেকে ফলন পেতে দুই-তিন বছর সময় লাগে।

হলুদ বারহী খেজুর

হলুদ বারহী খেজুরের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ইরাক। হলুদ রঙের গোলাকার ফল ও ফলের ওজন ১৬-২০ গ্রাম। ফল রসালো ও ফ্রিজিং এর পর মিষ্টি হয়। পর্যাপ্ত রোদ, কম আদ্রর্তা, শুকনা ও কম বৃষ্টিপাত, উষ্ণ আবহাওয়া এ ফল চাষের জন্য উপযোগী। বেশি শীত এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু গুনাগুন এ গাছের আছে। ফুল ফোটা ও ফল ধরার সময় বেশি বৃষ্টিপাত ভালো না। পানি নিস্কাশন সুবিধাযুক্ত অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রচুর আলো-বাতাস পায় এমন জমি খেজুর বাগানের জন্য নির্বাচন করা দরকার। বাগান তৈরির জন্য ২০ ফুট দুরত্ব সারি করে ২০ ফুট দুরে চারা রোপনের জন্য খেজুর বাগান নকশা তৈরি করে নেয়া প্রয়োজন। এক বা দুই সারি গাছ লাগানোর জন্য ১৫-১৭ ফুট দুরুত্ব দিলেই চলবে।

আম

আমের নাম তাইওয়ান গ্রীন। আম তো নয় যেন ছোটখাটো লাউ। গাঢ় সবুজ রঙের একেকটি আমের ওজন ৯০০ গ্রাম থেকে সোয়া কেজি। উচ্চমূল্য জাতসমূহ: তাইওয়ান গ্রীন, রেড, আলফানসো, আরউইন ইত্যাদি। বরেন্দ্র এলাকার মাটি ও জলবায়ু আম চাষের জন্য উত্তম। বহুকাল ধরে এসব অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের আম চাষ হয়ে আসছে।

থাই সুপার ফাষ্ট কাঁঠাল

আকারের দিক থেকে কাঁঠাল সবচেয়ে বড় ফল। উচ্চমূল্য জাত: গামলেস মিনি কাঁঠাল।

চারা তৈরি: সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়। ভালো পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২/৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে বীজতলায় বপনকরলে ২০-২৫ দিনে চারা গজাবে এছাড়া গুটিকলম, ডালকলম এর মাধ্যমে চারা তৈরি করা যায়।

চারা রোপন: ষড়ভূজি পদ্ধতিতে সুস্থসবল ও রোগমূক্ত চারা বা কলম এর মাধ্যমে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাসে রোপন করতে হয়। প্রতি গর্তের পরিমাণ: ১x১ x ১ মিটারকরে গর্ত তৈরি করতে হবে গাছ ও লাইনের দুরত্ব ১২ মিটার করে রাখা দরকার।

উপযুক্ত জমি ও মাটি: জল দাড়ায় না এমন উঁচু মাঝারি সুনিস্কাষিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী।

সার ব্যবস্থাপনা: রোপনের সময় প্রতি গর্তে গোবর ৩৫ কেজি, টিএসপি সার ২১০ গ্রাম, এমওপি সার ২১০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা: চারা/কলমের তাড়াতাড়ি বাড়বাড়তি হওয়ার জন্য পরিমিত ও সময় মতো সেচ প্রদান করা দরকার।

বল সুন্দরী বরই

বল সুন্দরী বরই দেখতে বলের মতো অত্যন্ত সুস্বাদু একটি কূল। এটির চাষাবাদ অত্যন্ত লাভজনক। অতি অল্প সময়ে এই বরই আমাদের দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটির চাষাবাদ অন্যান্য বরইয়ের মতো।

সফেদা

সফেদা এক প্রকার মিষ্টিফল। সফেদা গাছ বহুবর্ষজীবী, চিরসবুজ।

জাত: উচ্চমূল্য জাত হচ্ছে-থাই, হোয়াইট ইত্যাদি।

মাটি: ঘনবৃষ্টিপাত হওয়া অঞ্চলে সফেদা ভালো হয়। প্রায় সবরকমের মাটিতে চাষ করা যায়। তবে পানি নিস্কাশনের সুবিধাযুক্ত ঝুরঝুরে মাটি হলে বেশ ভালো হয়।

গর্ত তৈরি ও চারা রোপন: চারা রোপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন করুন। তারপর চারার সাইজ দেখে পরিমাণমতো গর্ত তৈরি করুন এবং ওই গর্তে গাছ লাগান।

সার প্রয়োগ: গাছ লাগানোর ৮-১০ দিন আগে গর্তটি জৈব সার মিশিয়ে ভরে দিন। জৈব সারের মধ্যে গোবর, খৈল, টিএসপি, ছাই ইত্যাদি পরিমান মতো দিতে হবে।

জাবাটিকাবা

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভাবে এর চাষ সম্ভব। চাষের জন্য অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন হয় না। জাবাটিকাবা হলো ব্রাজিলিয়ান গ্রেফট্রি। গাছটি এর বেগুনি-কালো, সাদা-পাল্পযুক্ত ফলের জন্য পরিচিত যা সরাসরি কান্ডের উপর বৃদ্ধি পায়; ফলগুলো কাঁচা খাওয়া যায় বা জেলি, আচার, রস বা শরাব তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল আসে। ফল পাকে ফেব্রুয়ারি-মার্চে।

গোলাপজাম

গোলাপজাম একটি উৎকৃষ্ট মানের ফল। ফল হিসাবে গোলাপজাম আমাদের দেশে খুব বেশি সুপরিচিত না হলেও এই ফল খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। দেখতে সুন্দর অবয়ব, পাকলে ফিকে হলুদ কিংবা হালকা গোলাপী রঙ ধারণ করে। আর এর গোলাপ ফুলের ন্যায় ঘ্রাণ যে কোন মানুষের মনকে বিমোহিত করে তোলে। কাঁচা ফলের রং সবুজ এবং স্বাদে কষ্টা। প্রতি ফলে সাধারণত দুইটি বীজ থাকে। তবে কিছু কিছু ফলে এক কিংবা তিনটি বীজও থাকতে পারে।

রোপনের সময়: জৈষ্ঠ্য ও ভাদ্র মাসে গোলাপজাম চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। এই ফলে প্রায় সব ধরণের পুষ্টি উপাদানই বিদ্যামান। মাঝারি আকারের এই ফলগাছ প্রায় ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

কালোজাম

এটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছ ১৪-৬০ ফুট বা এর বেশিও লম্বা হতে পারে। সরল, শাখা-প্রশাখাযুক্ত, ছাল ধূসর বর্ণের। পাতা সরল,বৃন্তক, প্রতিমুখ। মার্চ-এপ্রিলে ফুল আসে, ফুল সবুজ সাদা। ফল প্রথমে সবুজ থাকে যা পরে গোলাপি হয় এবং পাকলে কালচে বেগুনি রঙ ধারণ করে। স্বাদ মধুর ও কষভাবযুক্ত। ফলের মজ্জা হালকা গোলাপি ও রসালো। পুষ্টিকর ফল জাম দেখতে ১-২.৫ সেন্টিমিটার ডিম্বাকৃতির। জাম গাছের বাকল প্রায় ১ ইঞ্চি পুরু হয়। বাকলের রঙ ফিকে ধূসর এবং মসৃণ।

অ্যালোভেরা

ঘৃতকুমারি বা অ্যালোভেরা সর্বজন বিদিত এবং বহুল ব্যবহৃত ঔষধি গাছ যা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চর্চায় প্রসাধনি এবং সম্পুরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

শতমূলী

একটি ভেষজ উদ্ভিদ বাংলা নাম শতমূলী, ইংরেজি Asparagas।

সজি হিসেবে ব্যবহৃত শতমূলি লতা জাতিয় উদ্ভিদ। সাধারণত অন্য গাছ বা খুঁটিতে ভর করে আঁকাবাঁকা হয়ে বেড়ে উঠে। এর লতায় বাঁকানো কাটা থাকে। শরৎকালে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এর মূল হয়। মাঘ-ফাল্গুনে ফল আসে। কাঁচা অবস্থায় ফল সবুজ হয়। পাকলে লাল দেখায়। এই উদ্ভিদের গোড়ায় একগুচ্ছ মূল হয়, এ মূলকে শতমূল বা শতমূলী বলে। অনেকে শোভা বৃদ্ধির জন্য শখ করে বাড়ির সামনে বাগানে ফুল গাছের সাথে শতমূলী গাছ লাগিয়ে থাকেন। সাধারণত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে শতমূলী গাছ ভালো জন্মে। তবে দো-আঁশ ও বেলে মাটিতে অত্যাধিক হয়ে থাকে। ব্যবহার্য অংশ: কন্দমূল।

মিসরি দানা

এর পাতা খুবই মিষ্টি যা চিনির চেয়ে ৫০ গুন বেশি মিষ্টি বলে দাবি করা হয় এর শুকনো পাতা গুঁড়া করে ব্যবহার হয়। এর নির্যাস চিনি থেকে ২০০-৩০০ গুনে বেশি মিষ্টি। এটি ডায়াবেটিস এর কোন ক্ষতি করেনা বরং কমাতে সাহায্য করে। জাপান সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারি তারা তাদের মোট চিনি চাহিদার ৪০%এই স্টেভিয়া বা চিনি গাছ থেকে সংগ্রহ করে।

ডেউয়া

এর সংস্কৃত নাম 'লকুচ' ও হিন্দি নাম ডেউয়া। এর ফল সুস্বাদু এবং উপকারী। ডেউয়া গাছ বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বড় আকারের বৃক্ষ। প্রায় ২০-২৫ ফুট উচু হয়, এর ছাল ধূসর বাদামী রঙের। গাছের ভেতর সাদাটে কষ বা আঠা থাকে। এর পাতা ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৪-৭ ইঞ্চি চওড়া হয়,যা অনেকটা কাকডুমুরের পাতার ন্যায়, তবে আকারে সামান্য বড়। স্ত্রী ফুল আকারে বড়, বোটা ছোট ও মসৃণ। এ ফুলে পাপঁড়ি নেই, ছোট গুটির মত। স্ত্রী ফুল থেকে ফল হয়। ফল কাঁঠালের ন্যায় যৌগিক বা গুচ্ছফল। বহিরাবরন অসমান। কাচাঁ ফল সবুজ, পাকলে বহিরাবরণ হলুদ। ভিতরের শাঁস লালচে হলুদ। ফলের ভেতরে থাকে কাঠালের ছোট কোয়ার মত কোয়া এবং তার প্রতিটির মধ্যে একটি করে বীজ থাকে। সাধারণত মার্চ মাসে ফুল আসে এবং আগষ্ট মাসের দিকে ফল পাকতে শুরু করে। গাছ রোপনের উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল।

এলাচ

এলাচ মসলা জাতীয় ফসল যার ব্যবহার মিষ্টি বা ঝাল সব রকম খাবারের দেখা যায়। এটি মূলত আদা জাতীয় গাছ এবং গাছের পাতাগুলো একটু বেশি লম্বা ও চওড়া। এই গাছের গোড়ার দিক থেকে লম্বা ফুলের স্টিক বের হয়। এই ফুলের হচ্ছে এলাচ।

এলাচ চাষের জমিঃ উর্বর মাটি এবং হালকা রোদ্র ছায়া যুক্ত জায়গায় এলাচ গাছ জন্মায়। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ছায়ার মধ্যে এলাচ গাছের ফলন ভালো হয়। এলাচ চাষের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো জমির প্রয়োজন হয় না। অন্য গাছের ছায়ার নিচে অর্থাৎ মেহগনি, আকাশমনি বা এ জাতীয় বাগানের ভিতর (গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে) অথবা বাড়ির আঙ্গিনা অথবা ফলদ বৃক্ষের বাগানে এলাচ চাষ করলে এলাচের ভালো ফলন হয়। অন্য ফসলের মাঠে এলাচ চাষ করলে ফলন ভালো পাওয়া যায় না।

তেজপাতা

তেজপাতা রান্নার মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারা দেশে কম-বেশি তেজপাতা গাছ হলেও সিলেট চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগামে বেশি হয়ে থাকে। প্রায় সব ধরনের মাটি ও আবহাওয়ায় তেজপাতা জন্মাতে পারে। তবে সুনিস্কাশিত গভীর বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি তেজপাতা চাষের জন্য আদর্শ। সেক্ষেত্রে জমির প্রকৃতি অবশ্যই উঁচু হতে হবে। তেজপাতা একটানা অনেক দিন খরা সহ্য করতে পারে না।

কাউন

পরিচিতি: কাউন বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন ধরে চাষাবাদ হয়ে আসছে। ছোট দানা বিশিষ্ট শস্যটি এ দেশে গরীবের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের সাধারণত চরাঞ্চলে অথবা কম উর্বর জমিতে স্বল্প চাষে কাউনের চাষ করা হয়ে থাকে।
মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কাউনের চাষ করা যায়। তবে পানি দাঁড়ায় না এমন বেলে দোআঁশ মাটিতে এর ফলন ভালো হয়।
বপনের সময়: দেশের উত্তরাঞ্চলে অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য-ফেব্রুয়ারি)। পযর্ন্ত বীজ বোনা যায়।
বীজের হার: কাউনের বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বোনা যায়। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ সারিতে বুনলে সারির থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি রাখতে হবে। চারা গজানোর পর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে সারিতে চারার দূরত্ব ৬-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ

কাউন চাষে সচারাচর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। তবে অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নরূপ সার প্রয়োগ ফলন বেশি হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৩০-১৭০ কেজি
টিএসপি	১০০-১২৫ কেজি
এমওপি	৮০-৯০ কেজি
জিপসাম	৪৫-৫৫ কেজি
জিংক সালফেট	৩-৪ কেজি
বরিক এসিড	-

সেচবিহীন চাষে সবটুকু সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সেচের ব্যবস্থা থাকলে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: কাউন একটি খরা সহিষ্ণু ফসল। তবে রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১-২ টি হালকা সেচের ব্যবস্থা করলে ফলন ভাল হয়।
ফসল সংগ্রহ: কাউনের শীষ খড়ের রং ধারণ করলে বীজ দাঁতে কাটার সময় 'কট' করে শব্দ হলে বুঝতে হবে ফসল কাটার সময় হয়েছে।

চিয়া সীড

চিয়া বীজ খাওয়ার বীজ। বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে বা অন্যান্য খাবারগুলির উপরে শীর্ষে রাখা যায়া। স্বাস্থ্য সচেতনদের কাছে অনেক পরিচিত একটি উপাদান হচ্ছে চিয়া বীজ। এটিও ফাইবার এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটের একটি ভালো উৎস। চিয়া বীজ রক্তে শর্করা কমাতে সাহায্য করে থাকে। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাবারের পর রক্তের শর্করা কমাতে চিয়া বীজ অনেকটাই কার্যকর। এ ছাড়া আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তে শর্করা কমানোর পাশাপাশি, চিয়া বীজ ক্ষুধা কমাতেও অনেক সহায়ক। বেশি ফলনের জন্য বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে চাষ করতে হবে। তবে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেও বোনা যেতে পারে।

চীনাবাদাম

পরিচিতি

চীনাবাদাম একটি অর্থকরী ফসল। এটি একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য তেলবীজ। বীজে ৪৮-৫০% তেল ও ২২-২৯% আমিষ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে চীনাবাদাম চাষ করা হয়। চীনাবাদামের মোট উৎপাদন প্রায় ৪৭ হাজার মে. টন। উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্যবহার ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে চীনাবাদামের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

মাটি: বেলে দো- আঁশ মাটি, ক্যালসিয়াম ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি চীনাবাদাম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। এ ফসল পিএইচ ৬.০-৬.৫ এ ভাল হয়।

জমি তৈরি: জমিতে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় মই দিয়ে সমান করে জমির চার পাশে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরবর্তীতে সেচ ও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়।

বপনের সময়: চীনাবাদাম রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে আবাদ করা যায়। রবি মৌসুমে কার্তিক অগ্রহায়ণ, খরিফ-১ মৌসুমে ফাল্গুন-চৈত্র ও খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বপন করতে হয়।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি বা একর প্রতি ৪০ কেজি খোসাসহ বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন পদ্ধতি: বীজ বপনের আগে খোসা হতে বীজ আলাদা করে নিতে হবে। বীজ ও খোসার অনুপাত ৭ঃ৩ অর্থাৎ ১০ কেজি খোসাসহ বাদামের ৭ কেজি বীজ পাওয়া যায়। বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ হতে গাছের দুরত্ব ১৫ সেমি। বীজ ২.৫ থেকে ৩.০ সেমি মাটির গভীরে বপন করতে হয়। প্রতি গর্তে একটি করে পুষ্ট বীজ বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণ: চীনাবাদামের জমিতে নিচে উল্লিখিত হারে সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	বিঘা প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	৩.৫
টিএসপি	১২
এমওপি	১৬
জিপসাম	৪০
বরিক এসিড(প্রয়োজনে)	১.৪

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয় এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসাবে চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর গাছে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রতি কেজি বীজে ৭০ গ্রাম অণুজীব সার ব্যবহার করা যেতে পারে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয় না।

সেচ: বপন করার ১৮-২০ দিন পর ১ বার এবং শুঁটি হওয়ার ৫০-৫৫ দিন পর ২য় বার সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ: চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ বাদাম যখন পরিপক্ক হয় তখন উঠানোর সঠিক সময়। এ সময় গাছের নিচের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে এবং ঝরে পড়তে শুরু করে। বাদামের খোসার শিরা উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যায়।

বীনস

বীনস হল আঁশযুক্ত পুষ্টিকর খাবার এবং ক্যালরির পরিমান বেশি। এটি মাংশ এবং মাছের সাথে রান্না করে ভাতের সাথে খেতে খুবই সুস্বাদু। এটি তিন সময়ে বপন করা যায় যথা ঃ

(১) মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-এপ্রিল মাস (ফাল্গুন থেকে চৈত্র);

(২) মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুন মাস (জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়); এবং

(৩) মধ্য-অক্টবার থেকে মধ্য-ডিসেম্বর মাস (কার্তিক থেকে অগ্রহায়ন)।

যব

মাটি: পানি জমে না এমন বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি বার্লি চাষের জন্য উপযুক্ত । জমিতে 'জো' আসার পর মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

বপনের সময়: কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণ মাস (নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

বীজের হার: বার্লি ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ১০০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। সারিতে বুনলে ২ সারির মাঝে দূরত্ব ২০-২৫ সেমি রাখতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে ৩.৫ সেমি গভীর নালা টেনে তাতে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

আগাছা দমন: চারা গজানোর পর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ৮-১০ সেমি দূরত্বে একটি চারা রেখে বাকি চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ

সাধারণত অনুর্বর জমিতে চাষ করা হলেও সুপারিশমতো সার প্রয়োগে এর ফলন বাড়ানো যায়। বার্লির জমিতে নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৫০-১৮০ কেজি
টিএসপি	১০০-১২৫ কেজি
এমওপি	১০০-১২০ কেজি
জিপসাম	৪০-৬০ কেজি
জিংক সালফেট	৩-৫ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সেচের ব্যবস্থা থাকলে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (সেচের পর) প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১-২ টি হালকা সেচের ব্যবস্থা করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ: শীষ খড়ের রং এবং পাতা বাদামি হয়ে এলে বোঝা যাবে ফসল পেকেছে। চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য সপ্তাহ।

মিষ্টি ভুট্টা

পরিচিতি: মিষ্টি ভুট্টা (Sweet corn) বিশেষ এক ধরনের ভুট্টা। ভুট্টার মোচা কচি অবস্থায় সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়।

মাটি: উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটি অথবা পানি দাঁড়ায় না এমন এঁটেল মাটিতে মিষ্টি কর্ণ চাষ করা যায়।

জমি তৈরি: মাটির 'জো' থাকা অবস্থায় জমির প্রকারভেদে প্রথমে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

বপনের সময়: সারা বছর বেবী কর্ণ চাষ করা যায় (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ , আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস ছাড়া)।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি।

বীজের বপন পদ্ধতি: সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেমি। এতে প্রতি হেক্টর জমিতে ৮০,০০০-১,২৫,০০০ গাছ থাকবে।

সারের পরিমাণ: ইউরিয়া ২৫০-৩০০ কেজি, টিএসপি ১২৫-১৫০ কেজি, এমওপি ৮০-১০০ কেজি, জিপসাম (প্রয়োজনবোধে) ১২৫-১৫০ কেজি এবং জিংক সালফেট (প্রয়োজনবোধে) ৮-১০ কেজি

সারের প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ইউরিয়া সারের ১/৩ অংশ ও অন্যান্য সারের সবটুকুই জমিতে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ ভাগ করে চারা গজানোর ১৫-২০ দিন এবং ৩৫-৪০ দিন পর জমির উর্বরতাভেদে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতাভেদে সারের তারতম্য হতে পারে।

আগাছা দমন: গাছের বয়স ১ মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: রবি মৌসুমে সাধারণত ২ বার সেচের প্রয়োজন হয় এবং ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় সেচ দিলে ভালো হয়। খরিফ মৌসুমে খরা দেখা দিলে সেচ দিতে হবে। খরিফ মৌসুমে অতি বৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুইট কর্ণের পুরুষ ফুল/মঞ্জুরীদণ্ড অপসারণ: পুরুষ ফুল কচি অবস্থায় ফুটে বের হওয়ার পূর্বেই টাসেল ধরে টান দিয়ে অপসারণ করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ: নিচের দিকে মোচার মাথায় যখন সিল্কগুলো ১-৩ সেমি লম্বা হয় তখন ধারালো চাকু বা কাঁচি দ্বারা মোচাটি গাছ থেকে কেটে নিতে হবে।

ফলন: হেক্টরপ্রতি ফলন ১.২৭-১.৩০ টন (খোসা ছাড়া) এছাড়া গো-খাদ্য হিসেবে (গাছ) ১৫-২০ টন।

জীবন কাল: গ্রীষ্মকাল : ৫০-৬০ দিন, শীতকাল : ৭০-৮০ দিন।

ফলন: হেক্টরপ্রতিফলন ১.২৭-১.৩০ টন (খোসাছাড়া) এছাড়া গো-খাদ্য হিসেবে (গাছ) ১৫-২০ টন।

জীবনকাল: গ্রীষ্মকাল : ৫০-৬০ দিন, শীতকাল : ৭০-৮০ দিন।